১. **বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো:**

১.১ বর্ষাকালে এমনই ছিল (মেয়ারো/ব্রাজিল/ত্রিনিদাদ)।

১.২ নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি (ইতালিতে/লন্ডনে/স্পেনে) যা।

১.৩ (ধুত্তোর/নিকুচি/ভাল্লাগেনা) মনে মনে বললাম।

১.৪ ভেতরে-ভেতরে (গুমোট/দুর্যোগপূর্ণ/হিংস্র) আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম।

১.৫ অ্যামি ডাকে (হেড/টেল)।

২. **কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী পাশাপাশি বাক্য লেখো :**

২.১ বর্ষাকালে রাস্তায় ক্রিকেট খেলার সুযোগ মিলত অল্পই।

২.২ ওরা চেঁচাতে লাগল, 'নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি, স্পেনে যা।'

২.৩ ভেতরে ভেতরে হিংস্র আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম।

২.৪ লজ্জিত হয়ে মাটির দিকে তাকাই।

২.৫ খোলা মেজাজে বলে 'নে সেলো, তুইই আগে ব্যাট কর'।

২.৬ ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে দেখতে পাই।

শব্দার্থ: হুংকার— জোরে চিৎকার করা, গর্জন। আলশে— কার্নিস। বিষন্ন— দুঃখিত, মনখারাপ। অপার্থিব---অলৌকিক,অবাস্তব। নির্বিকার---উদাসীন, ভাবলেশহীন। অধীর--- অস্থির, চঞ্চল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়— কী করা উচিত ঠিক করতে না পারার অবস্থা। স্পেন— ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ। উদ্ভাসিত— উজ্জ্বল আভাযুক্ত। কলজে—'কলিজা' শব্দ থেকে এসেছে, হৃৎপিন্ড।

৩. **নীচের বাক্যংশগুলি কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেছে লেখো:**

৩.১ বাতাস ছুটে এসে বদ মেজাজ ঝাপট মারত।

৩.২ জামাকাপড় জুবজুবে।

৩.৩. বৃষ্টির ভয়ানক হাতুড়ি পড়তে লাগল।

৩.৪. তার মুখ উদ্ভাসিত।

৩.৫ ভার্ন ড্যাবড্যাব করে চায়।

৪. **নীচের বিশেষ্যগুলি বিশেষণে আর বিশেষণগুলি বিশেষ্যে বদলে বাক্য রচনা করো :**

গোমরা, হুজুগে, চিৎকার, সাহসী, অভিনব।

৫. **নীচের বাক্যগুলিতে কোন কোন শব্দে বচন কীভাবে নির্দেশিত হয়েছে তা লেখো :**

৫.১ ওরা হাসছে।

৫.২ ঝুলে-পড়া মেঘগুলো ঘন কালো হয়ে উঠত।

৫.৩ অ্যামি আমাদের উঠোনে।

৫.৪ এমন সময় কলজেটা যেন লাফ দিয়ে উঠল।

৫.৫ পকেট থেকে একটা পেনি বার করে বলে 'টস কর'।

৬. **নিম্নরেখ অংশের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৬.১ সবে দৌড়ে ফিরেছি বৃষ্টি থেকে ।

৬.২ আর মুখ একেবারে ভেজা।

৬.৩ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

৬.৪ আমি ছিটকে চলে গেলাম খাটের তলায়।

৬.৫ ভার্ন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে।

৭. **নীচের বাক্যগুলি থেকে উপযুক্ত প্রশ্ন তৈরি করো :**

৭.১ রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে ওদের যত আনন্দ, ঝমঝম বৃষ্টিতেও যেন তত।

৭.২ ভার্ন আলশের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল।

৭.৩ আবার কী ভয়ংকর বজ্রপাতের শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল।

৭.৪ দৌড়ে যাই যেখানে ভার্নের ব্যাট আর বল রেখেছিলাম।

৭.৫ আমি অনেকবার ঠিক করেছি সাহসী হব, কিন্তু যখনই বাজ পড়ত অমনি ছিটকে ঢুকতাম খাটের তলায়।

৮. **উদ্ধৃতি চিহ্ন পরিহার করে বাক্যগুলি নিজের ভাষায় লেখো :**

৮.১ 'আমি দু-নম্বর ব্যাট', ভার্ন বলে।

৮.২ সে বলে সেলো, ব্যাট আর বল কোথায়?

৮.৩ 'ভার্ন', সে চেঁচিয়ে ডাকে,' এই ভার্ন, দ্যাখ, সেলো!'

৯. **কোনটি কোন দেশের মুদ্রা উল্লেখ করো :**

পেনি, ডলার, পেসো, রুবল, টাকা।

১০. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১০.১ তোমার রাজ্যের কোন দিকে সমুদ্র রয়েছে?

১০.২ খেলাধূলা নিয়ে লেখা তোমার পড়া বা শোনা একটি গল্পের নাম লেখো।

১০.৩ ঘরের ভিতরের ও বাইরের দুটি খেলার নাম লেখো।

১০.৪ তোমার রাজ্যের একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লেখো।

১০.৫ তোমার জানা ঋতু বিষয়ক যে কোনো একটি ছড়ার প্রথম পংক্তি লেখো।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির দু/একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ মাঠের খেলাধূলার সঙ্গে রাস্তার খেলাধূলার ফারাকগুলি লেখো।

১১.২ সমুদ্রের ধারে ঝড় কীভাবে ভয়ংকর হয়ে ওঠে?

১১.৩ গল্পে মোট কটি কিশোর চরিত্রের সন্ধান পেলে? গল্পের একমাত্র বয়স্ক চরিত্রটি কে?

১১.৪ সেলো ভার্নের ব্যাট বল কেন ও কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল?

১১.৫ তাদের বিবাদ কীভাবে মিটে গেল?

১২. রাস্তায় ক্রিকেট খেলা গল্পটি পড়ে কোন কোন অনুষঙ্গে মনে হলো যে গল্পটি বিদেশি গল্প?

১৩. তোমার নিজের চেনা পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে গল্পের মিলগুলো সূত্রাকারে লেখো। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে দেশটির অবস্থান দেখে নাও।

‘নেবুর পাতায় করমচা / হে বৃষ্টি ধরে যা’ প্রচলিত ছড়ার এই অংশটুকুর উল্লেখ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে। যা উপন্যাসের ‘আম আঁটির ভেঁপু’ অংশের অন্তর্গত। ‘সিগনেট’ প্রকাশিত ‘আম আঁটি ভেঁপু’ বইটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই ছড়ার অংশটুকু রয়েছে।

দিন ফুরোলে

শঙ্খ ঘোষ

সূয্যি নাকি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে? সন্ধে হলো? দুচ্ছাই
আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।
লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো
কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!
আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ?

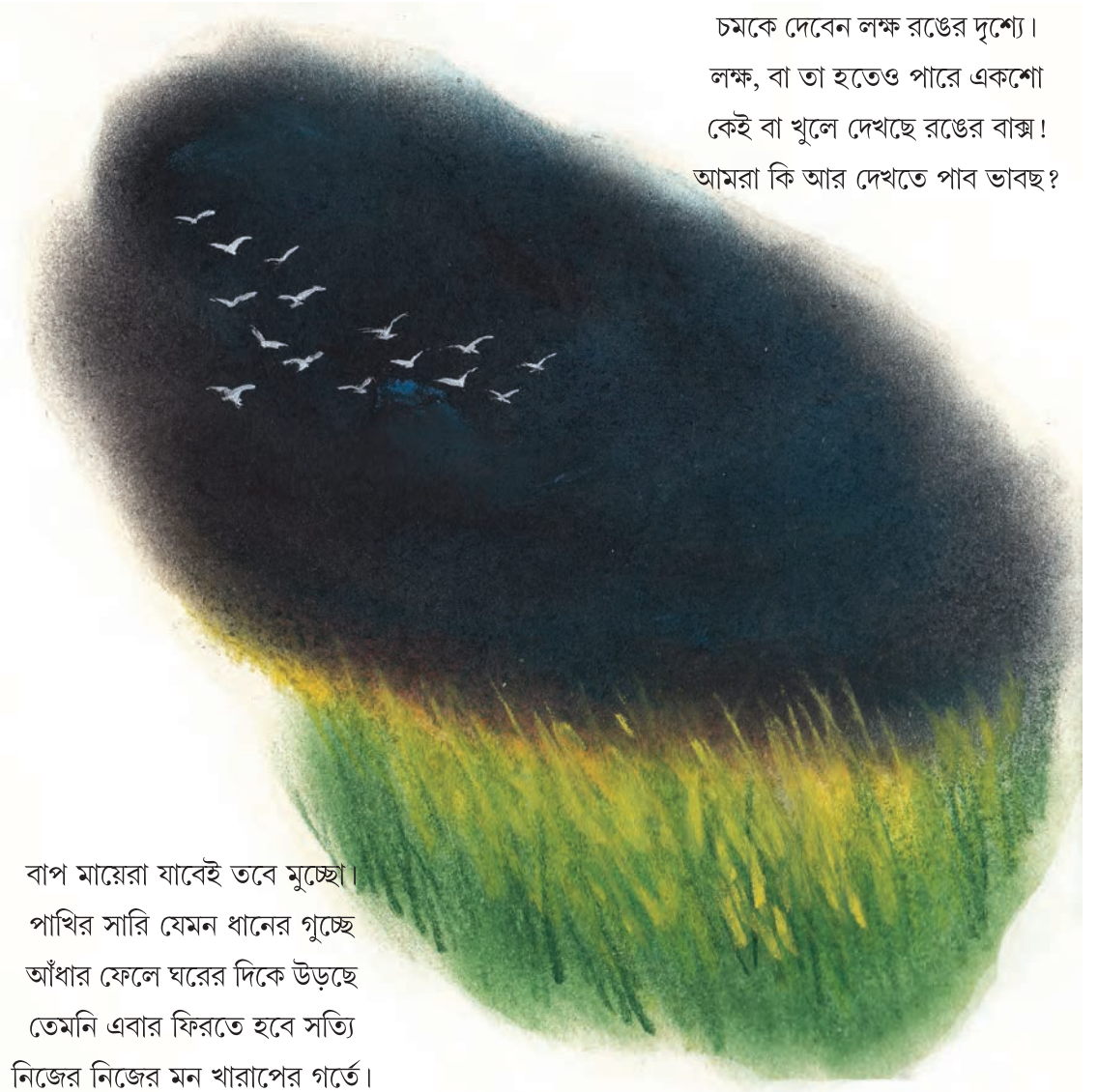

বাপ মায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।
পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে
তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন খারাপের গর্তে।
বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্ছা
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না? আচ্ছা!
মা বলবে, ঠ্যাং দুটো কী কুচ্ছিৎ।
এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

হাতেকলমে

১. কবিতাটিতে 'চ্ছ' দিয়ে কতগুলি শব্দ আছে লেখো, প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহার করে একটি করে আলাদা বাক্য লেখো।

২. **নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :**

সূর্য	>	
	>	দুচ্ছাই
মূর্চ্ছা	>	
	>	আঁধার
কুৎসিত	>	
	>	সন্ধে

৩. 'লক্ষ' -শব্দটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি পৃথক বাক্য লেখো। 'লক্ষ্য' শব্দটির সঙ্গে এই দুটি অর্থের পার্থক্য দেখিয়ে আরও একটি নতুন বাক্য লেখো।

৪. 'এক গঙ্গা জল' — শব্দবন্ধটির মানে 'গঙ্গায় যত জল ধরে সব' অর্থাৎ কিনা অনেকখানি জল। নীচের স্তম্ভদুটির ডানদিক ও বামদিক ঠিকভাবে মেলাতে পারলে আরো কিছু এরকম শব্দবন্ধ তৈরি করতে পারবে।

এক মাথা	হাসি
এক ক্লাস	আম
এক আকাশ	ধুলো
এক ঘর	ধান
এক কাঁড়ি	পায়েস
এক ঝুড়ি	ছাত্র
এক হাঁড়ি	তারা
এক মুঠো	টাকা
এক মুখ	লোক
এক কাহন	চিনি

৫. **নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্যরচনা করো :**

সূয্যি, দৃশ্য, বাক্স, বাপ-মা, গর্ত, ঠ্যাং, গাদা, ঘর, ধান, জল।

শব্দার্থ: দুচ্ছাই—দূরছাই , অবজ্ঞা ও বিরক্তিসূচক ধ্বনি। ঠ্যাং—পা। মুচ্ছো—মূর্চ্ছা, চৈতন্যলোপ। কুচ্ছিৎ—কুৎসিত, বিশ্রী।

৬. **নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে বের করো :**

বারি, অরুণ, অম্বর, পেটিকা, অজ্ঞান, গোছা, বিষাদ, কন্দর, পা, বিশ্রী।

৭. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নাও :**

ভালো, মিথ্যা, বাইরে, বুড়ো, সুশ্রী।

৮. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৮.১ চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।

৮.২ বাপ মায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।

৮.৩ কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স।

৮.৪ নিজের নিজের মন খারাপের গর্তে।

৮.৫ এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৯৩২) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। এছাড়াও লিখেছেন 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'শব্দ নিয়ে খেলা', 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি', 'শহর পথের ধুলো' ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই হিসেবে 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ছন্দোময় জীবন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৯. **এক কথায় উত্তর দাও :**

৯.১ সূয্যি ডুবে যাওয়ায় কথকরা 'দুচ্ছাই' বলছে কেন?

৯.২ কে এক্ষুণি আকাশ জুড়ে লক্ষ রঙের দৃশ্যে চমকে দেবেন?

৯.৩ কথকরা কেন সেই দৃশ্য দেখতে পাবে না?

৯.৪ কথকরা কেন বলেছে, 'কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!'?

৯.৫ বাপ মায়েরা কী হলে 'মুচ্ছো' যাবেন?

৯.৬ পাখিরা কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়?

৯.৭ কথকরা কেন বলেছে তাদের 'নিজের নিজের মনখারাপের গর্তে' ফিরতে হবে?

৯.৮ বাবা কী বলবেন?

৯.৯ মা-ই বা বাড়ি ফিরলে কী বলবেন?

৯.১০ কথকরা কেন 'এক গঙ্গা জল দিয়ে' পা ধুচ্ছে?

১০. ব্যাখ্যা করো :

১০.১ ''সূয্যি নাকি.....ডুব দিয়েছে?''

১০.২ ''আকাশ জুড়ে.....লক্ষ রঙের দৃশ্য।''

১০.৩ ''লক্ষ, বা তা হতেও পারে.....রঙের বাক্স!''

১০.৪ ''আমরা কি আর.....যাবেই তবে মুচ্ছো।''

১১. আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ কবিতাটি অবলম্বনে তোমার দেখা একটি গোধূলির রূপ বর্ণনা করো।

১১.২ কবিতাটিতে ছোটো ছেলেমেয়েদের কাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? সন্ধেবেলায় ঘরে ফেরাকে 'মনখারাপের গর্তে' ফেরা বলে কেন মনে হয়েছে? খেলা থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার দুঃখ নিয়ে তোমার অনুভূতি লেখো।

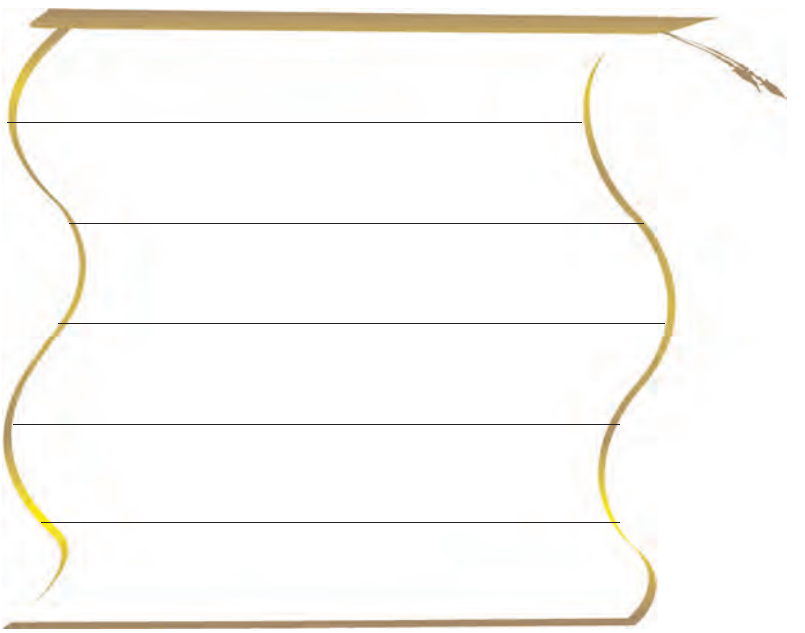

জাদুকাহিনি

অজিতকৃষ্ণ বসু

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জাদুকর ডেভিড ডেভান্ট একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি জনবিরল পথ দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি জোয়ান চেহারার লোক তাঁকে পাকড়াও করে বললে 'এই যে মশাই। অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি আপনাকে। আপনিই না টাকা বানান?'

ডেভান্ট একটু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা বলে কী ? একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

লোকটি বললে, 'মোটেই ভুল করিনি। আমার এই টুপিটি শিলিং দিয়ে ভরে দিয়ে যাবেন, তার আগে আপনাকে ছাড়ছিনে।' বলে মাথা থেকে টুপিটি নামিয়ে চিৎ করে ধরলে ডেভান্টের সামনে।

ডেভান্ট বুঝলেন পালাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না, দৌড়ে বা কুস্তিতে এ লোকটার সঙ্গে পারবেন না তিনি। কাল সন্ধ্যা, পথ নির্জন, চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেবার লোক নেই কাছাকাছি। সুতরাং লোকটিকে চটানো চলবে না। ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হবে। ডেভান্ট বললেন, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পকেটখানা তল্লাসি করে যা পাও সব নিয়ে নাও।'

'কত আছে তোমার পকেটে?' প্রশ্ন করল লোকটি।

ডেভান্ট বললেন, 'ছয় শিলিং।'

লোকটি বললে, 'ছোঃ! ও তো আমার টুপির তলায় এক কোণে পড়ে থাকবে। টুপিটা ভরে দিতে হবে বলছি না? আপনি হাওয়া থেকে ঝপাঝপ টাকা ধরেন, নিজের চোখে দেখেছি। আমার কাছে চালাকি?'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেভান্টের কাছে। একটি জাদুর খেলা আছে যার নাম 'কৃপণের স্বপ্ন' (Miser's Dream) অথবা 'হাওয়াই টাঁকশাল' এ খেলায় বারবার হাত খালি দেখিয়ে জাদুকর হাওয়া থেকে টাকা ধরে-ধরে পাত্র ভরে ফেলেন। টাকাগুলো অবশ্য হাওয়া থেকে আসবে না। খেলাটি নির্ভর করে প্রধানত পামিং (Palming) বা হাতের তালুতে এক বা একাধিক টাকা লুকিয়ে রাখা এবং গুপ্তস্থান থেকে টাকা নেওয়ার কৌশলের ওপর। ডেভান্ট বুঝলেন এই লোকটি কোনোদিন তাঁর এই খেলাটি দেখেছে আর ভেবে নিয়েছে সত্যিই হাওয়া থেকে টাকা ধরবার অলৌকিক জাদু তাঁর করায়ত্ত। ডেভান্ট লোকটিকে বোঝাতে গেলেন ; লোকটি খেপে উঠে বললে, 'ভারি বেয়াড়া, বেআক্কেল, বেদরদি লোক তো আপনি মশাই। চোখের সামনে দেখছেন অর্থাভাবে শুকিয়ে মরছি, আর আপনি হাত বাড়ালেই আঙুলের ডগায় টাকা এসে পড়ে তবু হাতটুকু বাড়াবার মেহনত করতে চান না। ভালো চান তো চটপট শুরু করুন। আর দেরি নয়।'

ডেভান্ট বুঝলেন, লোকটি গুন্ডা, গোঁয়ার অথবা পাগল ; এতক্ষণ শুধু মুখ চালাচ্ছিল, এইবার হাত চালাবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে তিনি কাজে লেগে গেলেন ; কিছুক্ষণ জাদুকরসুলভ ভঙ্গিতে হাওয়ায় হাত চালিয়ে হাওয়া থেকে একটি শিলিং ধরে লোকটির টুপির ভিতর ফেলে দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে বললে, 'বাঃ এই তো চমৎকার পেরেছেন। নিন, জলদি হাত চালান। টুপিটা পুরো ভর্তি করে দিতে হবে যে'।

ডেভান্ট ছোটো বড়ো অনেক আসরে জাদুর খেলা দেখিয়েছেন, কোনোদিনও কল্পনাও করেননি বিজন পথে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র দর্শকের সামনে এ হেন অসহায়ভাবে তাঁকে জাদু-প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গে মাত্র ছয়টি শিলিং, হাওয়া থেকে ছয় শিলিং-এর বেশি ধরা তাঁর জাদুবিদ্যায় কুলোবে না। বিপদ শুরু হবে তারপরই, কারণ মাত্র ছয় শিলিং দিয়েই লোকটির টুপি ভরবে না, মনও ভরবে না। শেষটায় কি ঐ গোঁয়ারের হাতে মার খেয়ে মরতে হবে? হাওয়া থেকে টাকা ধরার কাজটিকে তিনি নানা কায়দায় যথা সম্ভব বিলম্বিত করতে লাগলেন, যেন লোকজন এসে পড়ার আগেই সবগুলো শিলিং ফুরিয়ে না যায়।

ডেভান্টের ভাগ্য ভালো, তিনি হাওয়া থেকে লোকটিকে চার শিলিং ধরে দিয়ে আরো বিলম্বিত লয়ে পঞ্চম শিলিং ধরবার তোড়জোড় করছেন, বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে উদ্বেগে, এমন সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই চার-পাঁচ জন লোক এসে হাজির। তারা এই লোকটির খোঁজেই বেরিয়েছিল—লোকটির মাথা খারাপ। ডেভান্টের বেকায়দায় দুঃখ প্রকাশ করে তারা তাদের হারানিধিকে নিয়ে চলে গেল। ডেভান্ট হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বিখ্যাত জাদুকর ডেভান্টের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে একজন অখ্যাত জাদুকরের বিচিত্র কাহিনি মনে পড়ে গেল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি। চাঁদ মিয়া নামে একজন জাদুকর স্কুলের বড়ো হলে আমাদের জাদুর খেলা দেখালেন। বেশি খেলার পুঁজি ছিল না ভদ্রলোকের, ঘণ্টাখানেক খেলা দেখিয়েছিলেন তিনি। এখনকার চোখে তাঁর খেলা কেমন লাগত জানি না, তখন মন্দ লাগেনি। হাওয়া থেকে একটি-একটি করে টাকা ধরে তাঁকে একটি টিনের কৌটা ভরে ফেলতে দেখে আমরা সবাই বেশ

বিস্মিত হয়েছিলাম ; ভাবছিলাম এভাবে হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার বিদ্যেটা জানা থাকলে কি ভালোই না হতো! তাহলে টাকার জন্য কোনো ভাবনা থাকত না।

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের মনে একটু খটকাও লেগেছিল। জাদুকরের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য আমরা ছাত্রেরা এক আনা করে টিকিট কিনেছিলাম এবং প্রধান শিক্ষক মশাই কিছু চাঁদা দিয়েছিলেন। তাতে মোট দশ টাকার বেশি হয়নি, কিন্তু তাই পেয়েই জাদুকর চাঁদ মিয়া এত খুশি হয়েছিলেন যে, বোধহয় পাঁচ টাকা পেলেও তিনি অখুশি হতেন না। এ ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া লেগেছিল। হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার জাদু যাঁর জানা আছে তিনি হাওয়াই টাকায় কোটিপতি না হয়ে দীনহীনের মতো এই সামান্য টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান কেন? এ প্রশ্নের ভারি সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন জাদুকর চাঁদ মিয়া। বলেছিলেন, 'হাওয়াই জাদুর টাকা ভোগে লাগাতে নেই। লাগালেই জাদু আর লাগে না। হাওয়ার টাকা তাই আবার হাওয়াতেই ফিরিয়ে দিতে হয়।'

অজিতকৃষ্ণ বসু (১৯২২—১৯৯৩) : অ.কৃ.ব নামে বিখ্যাত এই লেখক সংগীত, সাহিত্য ও জাদুবিদ্যা—পারদর্শী ছিলেন এই তিনটি ক্ষেত্রেই। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষত ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের কবিতা এবং কৌতুকপ্রধান কথাসাহিত্য রচনার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁর 'পাগলা গারদের কবিতা' সিরিজ বা 'শঙ্করস উইক্‌লি'তে মুদ্রিত তাঁর বহু কৌতুক রচনা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর উদ্ভট খাপছাড়া কবিতাগুলি Lunarics নামে পরিচিত। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি হলো 'খামখেয়ালী ছড়া', 'আজব ছড়া', 'ছড়ার মিছিল' প্রভৃতি। সংগীত জীবনের নানা কথা ও কাহিনি তিনি বিবৃত করেছেন 'ওস্তাদ কাহিনী' গ্রন্থে। মঞ্চে কখনো জাদু প্রদর্শন না করলেও, তাঁর বন্ধু জাদুসম্রাট পি.সি.সরকারের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দীর্ঘ দিন জাদুচর্চা করেছেন তিনি। জাদুকরদের বিচিত্র জীবন ও নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর 'যাদুকাহিনী' বইটি ১৯৪৬ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছে 'নরসিংহদাস পুরস্কার'।

গাধার কান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাউন স্কুলের সঙ্গে মিশন স্কুলের ফুটবল ম্যাচ—কাপ ফাইনাল। শহরের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে—এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি ; তাই আজকের খেলাটা যে খুব জমবে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁচটা থেকে খেলা আরম্ভ হবে, কিন্তু চারটে বাজতে-না-বাজতেই মাঠে লোক জমতে আরম্ভ করেছে। দুই স্কুলের ছেলেরা মাঠের দু-ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুপক্ষের খেলোয়াড়েরা এখনো

মাঠে দেখা দেয়নি, তারা রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে।

খেলার মাঠ থেকে কিছু দূরে একটা বটগাছের তলায় টাউন স্কুলের ছেলেরা তৈরি হচ্ছিল। গিরীন তাদের ক্যাপটেন ; সে হাফ্-প্যান্টে কোমরবন্ধ বাঁধতে-বাঁধতে বললে, 'আরো পনেরো মিনিট বাকি, এখনও সমরেশ ফিরল না। আজ সর্বনাশ হলো দেখছি!'

টুনু টাউন স্কুলের একজন খেলোয়াড়; দেখতে অতি ক্ষীণ। সে জার্সির মধ্যে মাথা ঢোকাতে-ঢোকাতে জিজ্ঞেস করলে, 'সমরেশদা কোথায় গেছে?'

প্রণব সাজসজ্জা শেষ করে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি ; সে বললে, 'সমরেশ তুক্ করতে গেছে।'

টুনু একে ছেলেমানুষ, তায় সবে এ-বছর থেকে স্কুল-টিমে স্থান পেয়েছে, সে ভেতরকার সব কথা জানত না। অবাক হয়ে বললে, 'তুক্ কীসের পানুদা?'

প্রণব বিরক্ত হয়ে বললে, 'জানিস না, খেলার আগে গাধার কান না মললে আমরা হেরে যাই।'

টুনু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ!'

'ঠাট্টা?' প্রণব চোখ পাকিয়ে বললে, 'তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করব?' বলে টুনুর কানের দিকে হাত বাড়ালে।

টুনু তাড়াতাড়ি কান সরিয়ে নিয়ে বললে, 'তবে কি সত্যি সমরেশদা গাধার কান মলতে গেছে?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি?'

'হিঃ-হিঃ-হিঃ, গাধার কান—!' টুনু হঠাৎ হেসে উঠল।

গিরীন ভুরু কুঁচকে বললে, 'হাসছিস যে! গাধার কান মলা হাসির কথা নাকি? গেল বছর গাধার কান মলে আমরা কাপ জিতেছি ; তার আগের বছর গাধা পাওয়া গেল না—'

এই সময় হন্তদন্তভাবে সমরেশ এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী হলো, কী হলো?'

সমরেশের চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো ; সে বিমর্ষভাবে বললে, পেলুম না। শহরে কোথাও একটি গাধা নেই। সেই বেলা একটা থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

'ঘাটে খুঁজেছিলি?'

'ঘাটে, মাঠে, ধোবার বাড়িতে—কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি। নো গাধা। আশ্চর্য, আজকের দিনেই গাধাগুলো লোপাট হয়ে গেল।'

সকলের মুখেই বিপদের ছায়া পড়ল। গিরীন বললে, 'আর কী হবে। নে সমরেশ শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নে—আর সময় নেই।'

সমরেশ বিষণ্ণমুখে জার্সি পরতে লাগল ; কারণ গাধা পাওয়া যাক আর না যাক, খেলতে তো হবেই! সমরেশ বেচারা সারা দুপুর গাধার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ গাধা খুঁজে পায়নি ; তাই দুঃখটা তার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। বিশেষত আজ মিশন স্কুলের খেলা ; মিশন স্কুলকে হারাবে বলে তারা প্রাণপণ

প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু গাধার কান মলা হলো না! তার মানে—মিশন স্কুলকে তারা হারাতে পারবে না। আহা! একটা গাধার বাচ্চাও যদি পাওয়া যেত!

সমরেশ পায়ে অ্যাঙ্কলেট আঁটতে-আঁটতে এই কথা ভাবছিল এমন সময় তার কানে 'খিক্-খিক্' শব্দ এল। সে মুখ তুলে দেখলে, টুনু দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। সমরেশ কড়া সুরে বললে, 'হাসছিস কেন রে টুনু? টুনুর সবকথাতেই হাসি—শুনলে এত রাগ হয়!'

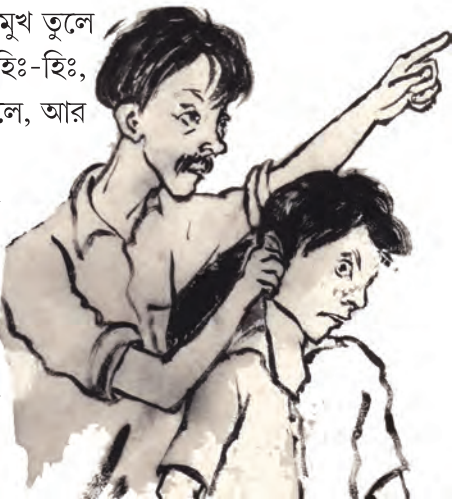

হাসি চাপবার চেষ্টায় টুনুর চোখে জল এসে পড়েছিল, সে মুখ তুলে বললে, 'না সমরেশদা,'—বলেই জোরে হেসে ফেললে,—'হিঃ-হিঃ, সমরেশদা, তুমি সারা দুপুর গাধার কান মলবার জন্য ঘুরে বেড়ালে, আর একটাও গাধা পেলে না! হিঃ-হিঃ—তুক্ করা হলো না!'

সমরেশ লাফিয়ে গিয়ে টুনুর কান ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে বললে, 'হাসি! তুক্ করার নামে হাসি! ছুঁচো কোথাকার! আজ আমরা হেরে যাব, আর হাসি হচ্ছে?'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে টুনু বললে, 'কে বললে হেরে যাব?'

'বলবে আবার কে? আমরা সবাই জানি, যখন গাধা পাওয়া যায়নি—'

'কখ্খনো না—দেখে নিয়ো! কান ছেড়ে দাও, লাগছে!'

গিরীন বললে, 'ছেড়ে দে সমর, খেলার আগে আর কিছু বলিসনি। কিন্তু যদি হেরে যাই—'

এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল।

* * *

দুই পক্ষের খেলোয়াড়রা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো। রেফারি দিব্যেন্দুবাবুকে দেখে টুনু গিরীনের কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করে বললে, 'ও গিরীনদা, রেফারি যে দিব্যেন্দুবাবু!'

দিব্যেন্দুবাবুকে বাঁশি হাতে দেখে গিরীনও দমে গিয়েছিল, তবু সে বললে, 'তাতে কী হয়েছে?'

'দিব্যেন্দুবাবু যে জিলিপি খায়!'

'চুপ্!'

স্কুলের ছেলেরা সবাই জানত যে, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি খেতে বড়ো ভালোবাসেন ; আর ম্যাচের আগে যে-পক্ষ তাঁকে জিলিপি খাওয়ায়, তিনি সেই পক্ষকে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যাহোক, এখন তো আর উপায় নেই, মিশন স্কুলের ছেলেরা নিশ্চয় তাঁকে পেট ভরে জিলিপি খাইয়েছে। টাউন স্কুলের খেলোয়াড়গণ আরও মুষড়ে গেল।

দিব্যেন্দুবাবু টস্ করলেন। গিরীন ব্যাকে খেলে, সমরেশ খেলে হাফ-ব্যাক থেকে ; আর টুনু রাইট-ইন। তাদের দলের বাকি ছেলেরাও বেশ ভালো খেলে, কিন্তু এই তিনজনের উপরেই ভরসা। টুনু ছেলেটি রোগা-পটকা, কিন্তু বল তার পায়ে পড়লে তাকে আটকানো শক্ত। দৌড়াতে পারে সে ঠিক হরিণের মতো!

মিশন স্কুলের দলও খুব মজবুত। তারা বেশির ভাগ বুট পরে খেলে, গায়ে জোরও বেশি ; কাজেই দুই দলের মধ্যে কারা জিতবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।

প্রথম মিনিট-দশেক মিশন স্কুল চেপে রইল—বল আর টাউন স্কুলের গোলের কাছ থেকে দূরে যায় না। গিরীন আর সমরেশ প্রাণপণে বল বের করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তবু গোল বাঁচাতে-বাঁচাতে গোল-কিপার প্রশান্ত হিমসিম খেয়ে গেল। দু'বার কর্নার হলো ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে গোল হলো না। তারপর একবার একটু ফাঁক পেয়ে সমরেশ বল বের করে দিল। বল গিয়ে টুনুর পায়ে পড়ল।

বল পেয়ে টুনু একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলে, তারপর বল নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটল। মিশন স্কুলের হাফ-ব্যাকেরা সব এগিয়ে গিয়েছিল, কাজেই ব্যাক আর গোল-কিপার ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।

ব্যাক—এরিয়ার মধ্যে পৌঁছাতেই একজন ব্যাক তেড়ে এল ; টুনু বলটি টুক করে সেন্টার-ফরোয়ার্ড রণজিতের পায়ের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে এগিয়ে এল। তখন দ্বিতীয় ব্যাক রণজিতকে চার্জ করলে রণজিৎ আবার বলটি টুনুর পায়ে এগিয়ে দিলে। সামনে আর ব্যাক কেউ নেই, শুধু গোল-কিপার। টুনু বল নিয়ে তিরের মতো গোলের পানে দৌড়োল।

কিন্তু বল গোলে শূট করবার আগেই ব্যাক দু'জন পিছন থেকে দুটো দৈত্যের মতো হুড়মুড় করে টুনুর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। একজন মারলে টুনুর পায়ে বুটসুদ্ধ এক লাথি। টুনু তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল; অমনি দ্বিতীয় ব্যাক বল কিক করে বের করে দিলে।

দিব্যেন্দুবাবুর বাঁশি বাজল। টুনু গড়াতে-গড়াতে উঠে বসে ভাবলে, নিশ্চয় দিব্যেন্দুবাবু ফাউল দিয়েছেন। পেনাল্টি!

কিন্তু হায়, দিব্যেন্দুবাবু পেনাল্টি দিলেন না ; উল্টে টাউন-স্কুলের বিরুদ্ধে অফসাইড দিলেন। রণজিৎ নাকি অফসাইডে ছিল।

আবার খেলা চলতে লাগল। টুনুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে বিষম লেগেছিল, সে ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে গিয়ে গিরীনকে বললে, 'দেখলে গিরীনদা, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি—'

গিরীন বললে, 'এখন ওসব কথা নয়, নিজের জায়গায় যা। দিব্যেন্দুবাবু যা খুশি করুন, আজ তোকে গোল দিতে হবে মনে থাকে যেন।'

ছলছল চোখে টুনু বললে, 'কিন্তু আমার বুড়ো-আঙুলটা ভেঙে গেছে যে—'

গিরীন বললে, 'তা যাক। কিন্তু গোল দেওয়া চাই-ই।'

টুনু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। খেলা তখন বেশ জোর চলছে ; একবার এ-দল গোলের কাছে বল নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও-দল নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে হাফ-টাইমের সময় এগিয়ে আসতে লাগল ; আর পাঁচ মিনিট বাকি। টুনু আরো দু'একবার বল পেলে ; কিন্তু বেচারার পা বেজায় ব্যথা করছিল। সে বেশি দৌড়তে পারলে না। বল আর-একজনকে পাস করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ মিশন স্কুল একটা গোল দিল। তাদের পাঁচজন ফরোয়ার্ড একসঙ্গে বল নিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে গেল, কেউ তাদের আটকাতে পারলে না।

আবার খেলা আরম্ভ হলো। একটা গোল দিয়ে মিশন স্কুলের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, তারা দুর্দান্তভাবে খেলতে লাগল। আবার গোল হয়-হয়।

কিন্তু আর গোল হবার আগেই হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

হাফ-টাইম হলে গিরীন এসে বললে, 'টুনু, তোর পায়ে কী হয়েছে দেখি?'

খেলোয়াড়রা মাঠের মঝেখানেই গোল হয়ে বসেছিল। কেউ বরফ খাচ্ছিল, কেউ লেবু চুষছিল ; টুনু আঙুলে বরফ চেপে বসেছিল, আস্তে-আস্তে পা বার করে দিলে।

'কই, কী হয়েছে?' বলে গিরীন আঙুল ধরে টান দিলে।

'উঃ-উঃ—ছেড়ে দাও গিরীনদা, বড্ড লাগছে—আঙুলের মাথাটা একেবারে মটকে গেছে!'

'ও কিছু নয়—এই দ্যাখ্ আমার কী হয়েছে।'

টুনু দেখলে, গিরীনের হাঁটুর নীচে ঠিক কথ্‌বেলের মতো ফুলে উঠেছে। সে বললে, 'উঃ, খুব ব্যথা করছে!'

'দূর! খেলার সময় কি আর ওসব মনে থাকে!' তারপর টুনুর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গিরীন বললে, 'টুনু, আজ তুই-ই ভরসা। একটা গোলে হেরে আছি, সে কিছুই নয়; তুই যদি চেষ্টা করিস তাহলে তিনটে গোল দিতে পারিস।'

টুনুর বুক ফুলে উঠল, সে বলল, 'পারব! কিন্তু পায়ের ব্যথায় যে দৌড়াতে পারছি না—'

'পায়ের ব্যথা ভুলে যা—শুধু মনে রাখ, আজ আমাদের জিততেই হবে।'

উৎসাহে ও উত্তেজনায় টুনুর গলা কেঁপে গেল, সে শুধু বললে, 'আচ্ছা—'

* * *

হাফ-টাইমের পর আবার খেলা আরম্ভ হলো।

এবার খেলা শুরু হতে-না-হতেই টুনুর কাছে বল গেল। পায়ের ব্যথা ভুলে টুনু বল নিয়ে দৌড়োল। এবার তার প্রতিজ্ঞা সে গোল দেবেই। দু'জন হাফ-ব্যাক টুনুকে আক্রমণ করলে ; তাদের পাশ কাটিয়ে বল নিয়ে আবার দৌড়োল।

সামনে দু'জন হুম্‌দো ব্যাক। টুনু কী করে, ব্যাক দুজনের মাথার উপর দিয়ে বল তুলে দিয়ে আবার ছুটল। বলটা পড়েছিল ঠিক গোল-কিপার আর টুনুর মাঝামাঝি; দু'জনেই বল ধরবার জন্যে ছুটে গেল। দু'জনের মধ্যে লাগল ভীষণ ঠোকাঠুকি। টুনু বেচারি উল্টে পড়ে গেল।

বলটা কিন্তু গড়াতে-গড়াতে গিয়ে গোলে ঢুকল।

'গোল! গোল!' দর্শকের এক অংশ বিরাট চিৎকার করে উঠল ; অন্য অংশ চুপ করে রইল। কিন্তু এবার আর অফসাইড বলবার জো নেই, টুনু একলা গোল দিয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু গোল দিলেন।

টুনু এই ফাঁকে গিরীনকে বলে এল, 'গিরীনদা, আঙুল ঠিক হয়ে গেছে!'

গিরীন তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'সে কী রে, কী করে ঠিক হলো?'

'ঐ যে গোল-কিপারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ; ব্যস, ঠিক হয়ে গেছে।'

এবার ঝড়ের মতো খেলা আরম্ভ হলো। মিশন স্কুলের ছেলেরাও ভালো খেলোয়াড়, তারা প্রাণপণে খেলতে লাগল। তাদের একটা দোষ, হারবার উপক্রম হলেই তারা মারামারি করে খেলতে আরম্ভ করে। কিন্তু মারামারি করে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না ; কারণ টাউন স্কুলের ছেলেরা এমনভাবে খেলে যে, গায়ে গা ঠেকে না—তাদের মারতে গেলে তারা পিছলে বেরিয়ে যায়। ফলে যারা মারতে যায় তাদেরই অসুবিধা হয় বেশি ;—মারতেও পারে না, অথচ খেলা খারাপ হয়ে যায়।

টুনু এবার অদ্ভুত খেলা খেলতে আরম্ভ করলে। তাকে পাঁচজন লোক ঘিরে থাকে, তবু আটকাতে পারে না। একে তার ছোট্ট শরীর, তার উপর তিরের মতো ছুটতে পারে। তাই তাকে আটকাতে গেলেই সে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যায়। তার খেলা দেখে মিশন স্কুলের ছেলেরা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! এইটুকু ছেলে—তার এ কী আশ্চর্য খেলা!

দেখতে-দেখতে টুনু আর একবার বল নিয়ে দৌড়াল। এবার ব্যাক দু'জন এমনভাবে তার সামনে দাঁড়ালো যে, একজনকে কাটিয়ে বেরুতে গেলেই আরেক একজনের সামনে পড়তে হয়। টুনু বলটি চট করে রণজিৎকে পাস করে দিলে। রণজিতের দিকে কারও নজর ছিল না, সবাই টুনুকে নিয়ে ব্যস্ত। রণজিৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গোলের কোণ ঘেঁষে বল মারলে। গোল-কিপার শুয়ে পড়ে বল ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ধরতে পারলে না।

শব্দ উঠল—'গোল! গোল!'

দ্বিতীয় গোলের পর মিশন স্কুল একেবারে দমে গেল। গোল খেয়ে যারা দমে যায় তারা আর জিততে পারে না। তাদেরও তাই হলো। টুনু তখন আরও দুটো গোল ঠুকে দিলে।

খেলা যখন শেষ হলো তখন টাউন স্কুল দিয়েছে চার গোল, আর মিশন স্কুল মোটে এক গোল।

* * *

খেলার পর ছেলেরা এক জায়গায় জটলা করছিল। হঠাৎ শানু বলে উঠল, 'আচ্ছা, আজ আমরা জিতলুম কী করে? গাধার কান মলা তো হয়নি!'

সকলে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। সত্যিই তো! এ-রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে?

সমরেশ হঠাৎ জোরে হেসে উঠল, 'বুঝেছি!'

সকলে বলে উঠল, 'কী! কী!'

সমরেশ বললে, 'মনে নেই! খেলার আগে টুনুর কান মলে দিয়েছিলুম! তাতেই গাধার কান মলার ফল হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল। শানু বললে, 'বেশ হয়েছে। এবার থেকে টুনুর কান মলে খেলতে নামলেই চলবে। আর গাধা খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

গিরীন হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'সে আসছে বছর দেখা যাবে। আজ টুনুই আমাদের হিরো!' এই বলে টুনুকে দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'বল থ্রি চিয়ার্স ফর টুনু! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!'

হাতেকলমে

১. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১.১ ‘শহরের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে’— এই ‘সাড়া পড়ার’ কারণ কী?

১.২ ‘এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি’— কোন দুই স্কুলের কথা বলা হয়েছে?

১.৩ ‘হিঃ হিঃ— তুক্ করা হলো না’— বক্তা কে? কাকে সে একথা বলেছে? কখন বলেছে?

১.৪ গল্পে ফুটবল খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু শব্দ রয়েছে, যেমন— হাফ-ব্যাক, রাইট-ইন, গোলকিপার, সেন্টার ফরোয়ার্ড, ব্যাক-এরিয়া ইত্যাদি। আরো কিছু শব্দ তুমি গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। এছাড়াও নিজস্ব কিছু সংযোজনও করতে পারো।

২. **নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে :**

ভুরু, গাধা, দুপুর, চোখ, বাঁশি, পাঁচ।

৩. **পদ-পরিবর্তন করো :** সন্দেহ, সজ্জিত, সর্বনাশ, উপস্থিত, মজবুত, শব্দ।

শব্দার্থ : রেষারেষি — বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাতার—শ্রেণি, পঙ্‌ক্তি। রণসজ্জা—যুদ্ধের বেশ/সাজ। কোমর বন্ধ—কোমরে বাঁধার পটি, বেল্ট। তুক—জাদুমন্ত্র, বশীকরণের প্রকরণ। হন্তদন্ত—ব্যস্তসমস্ত, অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত। উস্কোখুস্কো—রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। বিমর্ষ—দুঃখিত, বিষণ্ণ। লোপাট—নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত। বিষণ্ণ—দুঃখিত, ম্লান। বিদ্যুৎবেগে—অতি দ্রুত বেগে। ভ্যাবাচাকা—হতবুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা। জটলা—বহুলোকের একত্র সমাবেশ। উপক্রম—সূত্রপাত, আরম্ভ। উত্তেজনা—উদ্দীপনা, তীব্র প্রবল মানসিক আবেগ। উৎসাহ—আগ্রহ, উদ্যম, অধ্যবসায়। আক্রমণ—অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ, অধিকার বা জয় করবার জন্য হানা। প্রতিজ্ঞা—সংকল্প, দৃঢ় পণ/অঙ্গীকার, শপথ।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

রেষারেষি, ক্ষীণ, বিষণ্ণ, বিষম, উৎসাহ।

৫. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

আশ্চর্য, দুশ্চিন্তা, উপস্থিত।

৬. ‘ফিস ফিস করে বললে’ অর্থ অত্যন্ত আস্তে/নিচু গলায় বলা বোঝায়। ‘কথা বলা’র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, এমন কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ লেখো।

৭. ‘খেলোয়াড়গণ’— ‘খেলোয়াড়’ শব্দের সঙ্গে ‘গণ’ জুড়ে তাকে বহুবচনের রূপ দেওয়া হয়েছে। একবচন থেকে বহুবচনের রূপ পাওয়ার পাঁচটি কৌশল নতুন শব্দ গঠন করে দেখাও।

৮. **গল্প অনুসরণে নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৮.১ 'আজকের খেলাটা যে খুব জমবে তাতে সন্দেহ নেই।' — কোন বিশেষ দিনের কথা এখানে বলা হয়েছে? সেদিনের সেই 'খেলা'র মাঠের দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৮.২ 'সমরেশদা কোথায় গেছে?' — এই সমরেশদার পরিচয় দাও। সে কোথায়, কোন উদ্দেশ্যে গিয়েছিল? তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কি?

৮.৩ 'এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল'— 'রেফারি' টি কে? তাঁর সম্পর্কে ছেলেদের ধারণা কীরূপ ছিল? খেলার মাঠে তিনি কেমন ভূমিকা পালন করলেন?

৮.৪ খেলায় যে ফলাফল হলো, তাতে তুমি কি খুশি হলে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৮.৫ গল্পে যে ফলাফলের কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীতটি যদি ঘটত, তা হলে গল্পের উপসংহারটি কেমন হতো তা নিজের ভাষায় লেখো।

৮.৬ গল্পে বলা হয়েছে— 'আজ টুনুই আমাদের হিরো।'— তোমার টুনু চরিত্রটিকে কেমন লাগল? সত্যিই কি নায়কের সম্মান তার প্রাপ্য?

৮.৭ গিরীন কীভাবে খেলার মাঠে টুনুকে ক্রমাগত উৎসাহ আর সাহস জুগিয়েছিল তা আলোচনা করো।

৮.৮ 'অন্ধসংস্কারের প্রতি আনুগত্যের জোরে নয়, প্রবল প্রচেষ্টা আর মানসিক জোরেই জীবনে সাফল্য আসে'— 'গাধার কান' গল্পটি অনুসরণে উদ্ধৃতিটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৯. তোমার দেখা/খেলা কোনো ফুটবল ম্যাচের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ - ১৯৭০) : বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্ম। 'গৌড় মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ডিটেকটিভ কাহিনি গুলি শরদিন্দু-র স্মরণীয় সৃষ্টি। বড়োদের গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি শিশু কিশোরদের জন্য তাঁর লেখালেখির পরিমাণও কম নয়। শিশু সাহিত্যে তাঁর একটি স্মরণীয় নায়ক চরিত্র 'সদাশিব'। পরিণত বয়সে অনেকটা সময় মুম্বাই ও পুণেতে কাটানোয় শিবাজি-র প্রথম জীবনের নানা ধরনের বিচিত্র রসের কাহিনি ধরা দিয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে।

ভাটিয়ালি গান

জসীমউদ্দীন

ও আমার দরদী আগে জানলে
আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।
ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না আর
দূরের পাড়ি ধরতাম না।
আমি নবলাখ বাণিজ্যের বেসাত
এই নায় বোঝাই করতাম না।
ছিলো সোনার দাড় পবনের বৈঠা
ময়ূরপংখী নাও খানা
চন্দ্র সুরজ গলুই ভরি
ফুল ছড়াতে জোছনা।
শওঁ শওঁ শওঁ শওঁ দরিয়াতে উঠে ঢেউ
এই তুফানেতে কেউ গাঙ পাড়ি দিও না
ওরে বিষম দইরার পানি দেইখ্যা
ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।

লবঙ্গ লতিকার দেশে
যাবার ছিলো বাসনা
ওরে মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবিলো
উপায় কী তার বলো না।
কলকল ছলছল আগে চল আগে চল
নাই বল তবু বল
ওরে মাঝি তুই কেন
হলি আজ বিমনা
ও তোর সামনে নাচে বিজ্‌লি লয়ে
কন্যা সোনার বরণা।

ভাটিয়ালি পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতির প্রকার বিশেষ। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশুদ্ধ ভাটিয়ালিতে তাল থাকে না। এ গান ছন্দ প্রধানও নয়। সাধারণত খোলা মাঠে রাখালের মুখে বা নদীর বুকে মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। বিষয় এবং অবস্থাভেদে ভাটিয়ালিতে অনেক শ্রেণি আছে। একদিক দিয়ে ভাটিয়ালিকে পূর্ববঙ্গের বহুবিধ লোকগীতির ভিত্তিস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। রূপকথার গানে ও কিছু মেয়েলি গানের গীতিরীতিতে ভাটিয়ালির আভাস আছে। এই গান দুই-বাংলারই নিজস্ব সম্পদ। এইসব গানে বাংলার নদীমাতৃক প্রকৃতির সঙ্গে দেহতত্ত্ব, গুরুসাধনার কথাও মিশে আছে। মুখে মুখে এই গানগুলি প্রচলিত হলেও, কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় যাঁরা ভাটিয়ালি গান রচনা করেছেন ও সুর দিয়েছেন। যেমন সিরাজ আলি, রশিদউদ্দিন, জালাল খান, জং বাহাদুর, শাহ আবদুল করিম, উমিদ আলি প্রমুখ। গায়ক আব্বাসউদ্দিন এই ধারার গানের বিখ্যাত নাম।

জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬) : বিখ্যাত কবি, গীতিকার, লোকসংস্কৃতি গবেষক। তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে 'পল্লীকবি' হিসেবেই অধিক পরিচিত। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে বিখ্যাত এই ভাটিয়ালি গানটি জসীমউদ্দীনের 'রঙিগলা নায়ের মাঝি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

পটলবাবু ফিল্মস্টার

সত্যজিৎ রায়

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরের থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন

'পটল আছ নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানি বাড়ির পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? সক্কাল-সক্কাল?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে?'

'এই ঘণ্টাখানেক। কেন?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো? আজ তো ট্যাগোর্স বার্থডে। আমার ছোটোশালার সঙ্গে কাল নেতাজি ফার্মেসিতে দেখা হলো। সে ফিল্মে কাজ করে—লোকজন জোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সিনের জন্য একজন লোক দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিশ দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেন্টও দেবে অবশ্যি...'

সক্কালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেননি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বৈকি। এ যে একেবারে

অভাবনীয় ব্যাপার!

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এককালে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে 'না', বলার আর কী আছে? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি! কী নাম বললেন আপনার শালার?'

'নরেশ। নরেশ দত্ত। বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা। দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নির ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলংকা কিনে ফেললেন। আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন। এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এককালে পটলবাবুর রীতিমতো অভিনয়ের শখ ছিল। শুধু শখ কেন— নেশাই বলা চলে। যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে, পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা। হ্যান্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর। একবার তো নীচের দিকে আলাদা করে বড়ো অক্ষরে নাম বেরুল—পরাশরের ভূমিকায় শ্রী শীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু)। তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর। উনিশশ চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যান্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভটচাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। কটা বছর কেটেছিল ভালোই। আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে। তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হলো ছাঁটাই, আর পটলবাবুর নবছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর। গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায়। তারপর একটা বাঙালি আপিসে কেরানিগিরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়োকর্তা বাঙালি সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি। তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন পটলবাবু! কিন্তু যে-অভাব, যে-টানাটানি, সে আর দূর হয়নি কিছুতেই। সম্প্রতি তিনি একখানি লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

আর অভিনয়? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কী। নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভালো, তাই কিছু ভালো ভালো পার্টের ভালো ভালো অংশ এখনও মনে আছে!—'শুন পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল মহারণে। জিনি শত পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—বৃকোদর সঞ্চালনে!'...ও! ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন!' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতলভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন!'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ... মানে চলবে তো?

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল? রবিবার?'

'হ্যাঁ...কোনো স্টুডিয়োতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ের ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো? সাততলা বিল্ডিং একটা? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না?'

'পার্ট হলো গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কী! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজি পেডেস্ট্রিয়ান।... ভালো কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রং তো?'

'বাদামি গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না! আর আমাদের সিনটাও শীতকালের, ভালোই হবে... কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস!'

পটলবাবুর ধাঁ করে জরুরি প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

'পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো? কথা বলতে হবে তো?'

'আলবত! স্পিকিং পার্ট!...আপনি আগে অভিনয় করেছেন তো?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...'

'তবে! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন? সে তো রাস্তা থেকেই যে কোনো একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হলো!...ডায়লগ আছে বৈকি এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। 'আসি...'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি—বুঝলে গিন্নি—এ পার্টটা হয়তো তেমন একটা বড়ো কিছু নয়; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড়ো কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো? মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা; আর তাঁর থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো? ওয়াটস সাহেবের হ্যান্ডশেক মনে আছে? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মেডেল? অ্যাঁ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ! কী বলো অ্যাঁ? মান, যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে, হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি!...

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নি বললেন, 'করো কী?'

'কিচ্ছু ভেব না গিন্নি। শিশির ভাদুড়ি সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি!'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনোদিন কিচ্ছু হয় না?'

'হবে হবে! সব হবে! ভালো কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক...'

পরদিন সকালে মেট্রোপলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও মিশন রো-এর ফ্যারাডে হাউসে পৌঁছতে লাগল আরও মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়ো—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডাণ্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মতো দেখতে জিনিস। এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালিও লক্ষ করলেন পটলবাবু; কিন্তু এদের যে কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায়? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই চেনেন না!

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলার চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে!'

অতুলবাবু? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দায় একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রী শীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামে জানত।'

'ও! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন বছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করেছি; লেট হইনি একদিনও। নট এ সিঙ্গেল ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'নরেশ!'

'স্যার?'

'উনি কি আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনি... মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো; শট নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়োস্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোনো মিলই তো নেই! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার।

কিন্তু তাঁর ডায়লগ কই? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনও তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি? ওই তো নরেশবাবু! একবার তাঁকে বলা উচিত নয় কি? পার্ট ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, ভালো করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সেই পার্ট! না হলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয়। আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয়নি যে!

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চিৎকার শুনে থমকে গেলেন।

'সাইলেন্স!'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট নেওয়া হবে! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না!'

তারপর আবার সেই প্রথম গলার চিৎকার এল—'সাইলেন্স! টেকিং!' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন; গলার একটা চেন থেকে দূরবিনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয়নি!

এবারে পর পর আরও কতগুলো চিৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউন্ড!' 'রানিং।' 'অ্যাকশন!'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপি-রং-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হনহনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চিৎকার শুনলেন 'কাট', আর অমনই সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন,'ছোকরাটিকে চিনলেন তো?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চারখানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার।

কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি। ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচড়াপাড়ার মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে; বেড়ে ফিমেল পার্ট করত চিনু!

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির

নাম কী মশাই?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না। উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে।'

যাক। কতগুলো দরকারি জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নি যদি জিজ্ঞেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তা হলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে!'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমার ডায়ালগটা যদি এইবেলা দিতেন তো—'

'ডায়ালগ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক!'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো! সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু...এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো। দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটি লাল কলম বার করে শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ'।

আঃ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন? কঠিন মনে হচ্ছে?'

এরা কি তা হলে ঠাট্টা করছে? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদী মানুষকে ডেকে এনে এতবড়ো শহরের এতবড়ো রাস্তার মাঝখানে ফেলে রংতামাশা? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'শুধু ''আঃ''? আর কোনো কথা নেই?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু? ও কি কম হলো নাকি? এ তো রেগুলার স্পিকিং পার্ট! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পিকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই! জানেন, আমাদের এই ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শো লোক পার্ট করে গেছে যারা কোনো কথাই বলেনি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেওনি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত

দেখা যায়নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন ল্যাম্প পোস্টের পাশে; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সিনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকী আমাদের যে নায়ক চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোনো ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু— ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড়ো চাকুরে। সিনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি— একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপনার দিকে দৃকপাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরোচ্ছে—বুঝেছেন? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে দেখুন!'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধা হবে। আরেকটা শট আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড়দৃষ্টিতে দেখে, আশেপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কি না দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ!'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল।

শুধু একটিমাত্র কথা কথাও না, শব্দ— আঃ!

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মণখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-নটা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামাসংগীত হয় রবিবার সকালে; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই যাবেন নাকি চলে? গেলে ক্ষতিটা কী? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেইসঙ্গে।

'সাইলেন্স'!

দুর! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। এর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার...থিয়েটার...

অনেককাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা—'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোটো পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনো অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হলো পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশি মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশি। পটলবাবুর নাট্যগুরু ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশি, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরও একটা কথা বলতেন পাকড়াশি মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হলো এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়তো তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হলো তোমার—অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশির কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই? একমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে— 'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এককথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ—পটলবাবু বারবার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠান্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরও আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া আরও কতরকম আঃ রয়েছে— দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোটো করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ'-টাকে খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হলো তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি? এই একটা কথা সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে!

'সাইলেন্স!'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া'?

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরও আধ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন'।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অপেক্ষা করব বইকী! আমি এই কাছাকাছিই আছি।'

'দেখবেন, আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালোই হলো। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে-কজন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেইসঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কীরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কীরকম ভাবে

চিতিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কীরকম হতে পারে— এই সবই একটা কাচের জানলায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল; এখন আর তাঁর মনে কোনো নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ; পঁচিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড়ো দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'বেশ। আমি প্রথম বলব 'স্টার্ট সাউন্ড'। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলবে 'রানিং'। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব 'অ্যাকশন'! বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এইদিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এইরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন?'

পটলবাবু বললেন 'একটা রিহার্সাল...?'

'না না,' বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শটটা।'

'কেবল একটা কথা...'

'আবার কী?'

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই... মানে অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো... ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো... হ্যাঁ। এইবার এই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান।

চঞ্চল তুমি রেডি?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার'।

'গুড। সাইলেন্স!'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্ট, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কীরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টিনের বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধাক্কিতে খুলে যাবে না তো?'

ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন? আপনি দারা সিং-এর সঙ্গে কুস্তি করুন না— তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে আয়না ছিল, পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো! বেশ মানিয়েছে! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স! সাইলেন্স!'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে

সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ করলেন সমবেত জনতার বেশিরভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর পটলবাবু ধাক্কার জায়গায় পৌঁছোবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দুজনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তা হলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছআনা বিস্ময় মিশিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন!'

জয় গুরু!

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার সঙ্গে তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে কাগজটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হলো কি?' পটলবাবু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভালো অভিনেতা মশাই!... সুরেন, কালো কাচটা একবার চোখে লাগিয়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগেনি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি। গগন পাকড়াশি আজ তাকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে আর পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে! সাইলেন্স! সাইলেন্স!... ওহে নরেশ, চলে এসো, ভিড় সামলাও!'

১. **বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো :**

১.১ পটলবাবু অভিনয়ের সময়ে সংলাপ হিসেবে বলেছিলেন (ওঃ/উঃ/আঃ) শব্দটি।

১.২ অভিনয়ের সময় পটলবাবুর হাতে ছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা/যুগান্তর/স্টেটসম্যান)।

১.৩ অভিনয়ের সময় পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল (ঝুঁপো/চাড়া-দেওয়া/বাটারফ্লাই) গোঁফ।

১.৪ (বরেন দত্ত/বরেন মল্লিক/বরেন চৌধুরী)-র পরিচালিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন পটলবাবু।

১.৫ করালীবাবুর বাড়িতে (কীর্তন/শ্যামাসংগীত/কথকতা) হয় (শনিবার বিকেলে/রবিবার সকালে/রবিবার বিকেলে)।

২. **নীচের এলোমেলো ঘটনাগুলি গল্পের ঘটনাক্রম অনুযায়ী লেখো :**

২.১ টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?

২.২ তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।

২.৩ পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে?'

২.৪ দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

২.৫ সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা?

২.৬ ঠিক আধঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল, এখন আর তাঁর মনে কোনো নিরুৎসাহের ভাব নেই।

৩. **গল্প থেকে এই যে অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে, শুটিং-এর সেই ব্যস্ত পরিস্থিতিটি তোমার নিজের ভাষায় নতুন করে লেখো:**

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই... মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে...'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো... ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো... হ্যাঁ। এইবার এই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি?

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার।'

'গুড। সাইলেন্স।'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্ট, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টরটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কীরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

৪. **নীচের শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দ পাঠ্য অংশটিতে পাবে। খুঁজে নিয়ে লেখো :**

উৎসাহহীন, নিরালা, অপ্রত্যাশিত, নিরুপদ্রব, লাঞ্ছিত, সন্ধান, প্রশংসা, পথিক।

৫. **নীচের শব্দগুলিতে যে ইংরেজি শব্দগুলি আছে, তার বদলে বাংলা শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার নতুন করে লেখো :**

৫.১ বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট?

৫.২ এই, দাদুকে ডায়ালগ লিখে দে।

৫.৩ একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজি পেডেস্ট্রিয়ান...

৫.৪ তাহলে একটু ওদিকে সরে গিয়ে ওয়েট করুন।

৫.৫ আজ তো ট্যাগোরস বার্থ ডে।

৫.৬ সাইলেন্স! রোদ বেরিয়েছে।

৫.৭ থিয়েটার এর চেয়ে শতগুণে ভালো...

৫.৮ আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।

৬. **নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

দোহারা, ব্যস্তসমস্ত, আমুদে, অন্যমনস্ক, দরকারি, গম্ভীর, নির্জন, আচ্ছন্ন।

৭. **নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

প্রস্তাব, অভিনয়, ফরমাশ, ঔদ্ধত্য, পরিশ্রম, সাফল্য, উৎকণ্ঠা, আত্মতৃপ্তি।

শব্দার্থ : হদিস— সন্ধান, খোঁজখবর। নগণ্য— সামান্য, তুচ্ছ, গণনার অযোগ্য। অভাবনীয়— অপ্রত্যাশিত। ফরমাস— আদেশ, নির্দেশ। স্মরণশক্তি— মনে রাখার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি। বৃকোদর— ভীম। আগন্তুক— অতিথি, অপরিচিত অভ্যাগত। পথচারী— পথিক। প্রতিপত্তি— সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব। ঠাহর— মনোযোগ দিয়ে দেখা। অপদস্থ— লাঞ্ছিত, অসম্মানিত। পরিহাস— ঠাট্টা, কৌতুক। নিরীহ— নিরুপদ্রব, শান্তশিষ্ট। নির্বিবাদী— নির্বিরোধ। নিষ্ঠুর— নির্মম, দয়াহীন। দৃকপাত— ভ্রূক্ষেপ, ফিরে তাকানো। ঋষিতুল্য— ঋষির মতো জ্ঞানী ও শ্রদ্ধার্হ। নিরুৎসাহ— হতাশ, উৎসাহহীন। বাজিমাত— বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব, খেলার জয়যুক্ত সমাপ্তি। নিরিবিলি— নিরালা, নিভৃত। বাসিন্দা— বাসকারী, অধিবাসী। তামাশা— ঠাট্টা, কৌতুক, পরিহাস। রোমাঞ্চ— পুলক। আন্দাজ— অনুমান। তারিফ— প্রশংসা। আত্মতৃপ্তি— নিজের সন্তোষ। আচ্ছন্ন— অভিভূত। কদর— মর্যাদা, যোগ্যতা।

৮. **নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ, অনির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ আর পূরণবাচক শব্দগুলি খুঁজে বার করে লেখো :**

৮.১ নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্‌চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ি পরেই থাকেন।

৮.২ বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা।

৮.৩ বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা.... অনুমান করা কঠিন বৈকি!

৮.৪ পটলবাবুর ন'বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

৮.৫ তারপর এই দশটা বছর .... কী-না করেছেন পটলবাবু।

৮.৬ সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন।

৮.৭ ...পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে.... চলতে আরম্ভ করলেন।

৯. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে বদলে লেখো :**

উৎকণ্ঠা, প্রয়োগ, উচ্চারণ, বিরক্তি, দম্ভ, ঔদ্ধত্য, অনুভব, পরিবেশন

১০. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :**

টক করে, ধা করে, তিড়িং করে, হন্তদন্ত হয়ে, ঠাহর করে, ঝিমঝিম করে, ফিসফিস করে, টুক করে।

১১. **নীচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :**

গভীর, বিকৃত, নির্জন, সার্থক, সংযত, নির্বিবাদী, তীব্র, উচিত

১২. **নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১২.১ নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু।

১২.২ এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন।

১২.৩ নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

১২.৪ শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

১৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১৩.১ পটলবাবুর কাছে যেদিন ফিল্মে অভিনয়ের প্রস্তাব আসে, সেদিন ছুটির দিন ছিল কেন?

১৩.২ বাজারে গিয়ে কেন গৃহিণীর ফরমাশ গুলিয়ে গেল পটলবাবুর?

১৩.৩ থিয়েটারে পটলবাবুর প্রথম পার্ট কী ছিল ?

১৩.৪ উনিশশো চৌত্রিশ সালে পটলবাবু কলকাতায় বসবাস করতে এলেন কেন?

১৩.৫ পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়া আর হলো না কেন পটলবাবুর?

১৩.৬ পটলবাবু তাঁর সময়নিষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য কোন উদাহরণ দিতে ভালোবাসতেন?

১৩.৭ 'পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল'— পটলবাবু এমন লজ্জা পেলেন কেন?

১৩.৮ 'গগন পাকড়াশি আজ তাঁকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন'— তিনি খুশি হতেন কেন?

১৪. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৪.১ 'আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল'— কার মনে পড়ে গেল পটলবাবুর কথা? পটলবাবুর কথাই বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ল কেন?

১৪.২ 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনোদিন কিচ্ছু হয় না?' পটলবাবুর গৃহিণীর এই মন্তব্যের কারণ কী?

১৪.৩ কার উপদেশের স্মৃতি পটলবাবুর অভিনেতা-সত্তাকে জাগিয়ে তুলল? কোন 'অমূল্য' উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন পটলবাবুকে?

১৪.৪ 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়— ওঃ!' বক্তা কে? কোন ঘটনার ফলে তাঁর এমন মন্তব্য?

১৪.৫ 'এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি'— এই অনুভব কীভাবে জাগল পটলবাবুর মনে?

১৪.৬ পটলবাবুর ফিল্মে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রোডাকশন ম্যানেজার নরেশ দত্তের অনেকগুলি ব্যস্ত মুহূর্ত। টুকরো মুহূর্তগুলি জোড়া দিয়ে নরেশ দত্ত নামে মানুষটির সম্পূর্ণ ছবি নিজের ভাষায় তৈরি করো।

১৫. দশটি বাক্যের মধ্যে উত্তর দাও :

১৫.১ 'আঃ'— এই একটিমাত্র শব্দের উচ্চারণ কৌশলে আর অভিনয়দক্ষতায় 'একটা আস্ত অভিধান' লিখে ফেলা যায়, শব্দটি নিয়ে ভাবতে এমনটাই মনে হয়েছিল অভিনেতা পটলবাবুর। পটলবাবুর ভাবনাধারা কি ঠিক বলে মনে হয় তোমার? 'আঃ-শব্দের উচ্চারণে কত ধরনের ভাবপ্রকাশ সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?

১৫.২ 'সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা! আচ্ছা ভোলা মন তো!' তোমার কী মনে হয়, সফলভাবে কাজ করার পরেও কেন টাকা না নিয়েই চলে গিয়েছিলেন পটলবাবু? পটলবাবুর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি কি যথার্থ বলে মনে হয় তোমার? নিজের যুক্তি দিয়ে লেখো।

১৫.৩ কেমন করে শুটিং চলে, তার জীবন্ত কিছু টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে এই গল্পের আনাচে কানাচে। সেই সব টুকরো জুড়ে জুড়ে নিজের ভাষায় শুটিং-এর মুহূর্তগুলির একটি সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করো।

১৫.৪ অভিনয়ের নানা ধরনের প্রসঙ্গ এই গল্পে ছড়িয়ে আছে। থিয়েটার আর সিনেমার অভিনয়ের ধরনে সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্যের কিছু কথা মনে এসেছিল পটলবাবুর। পটলবাবুর মতামত নিজের ভাষায় লিখে, এবিষয়ে তোমার কোনো মতামত থাকলে তাও জানাও।

১৫.৫ বছর পঞ্চাশের বেঁটেখাটো টাকমাথা নাট্যপ্রিয় পটলবাবুকে তোমার কেমন লাগল নিজের ভাষায় লেখো।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১— ১৯৯২) : বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। বিশ্ববন্দিত এই চলচ্চিত্রকার একই সঙ্গে সংগীতস্রষ্টা, প্রচ্ছদশিল্পী, সাহিত্য রচয়িতা। দীর্ঘকাল 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—' সোনার কেল্লা', 'বাদশাহী আংটি', 'এক ডজন গপ্পো', 'আরো বারো'। ১৯৬৭ সালে তাঁর 'প্রফেসার শঙ্কু' শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থরূপে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৯২ সালে তিনি 'ভারতরত্ন' পান।

পটলবাবু ফিল্মস্টার গল্পটি তাঁর 'এক ডজন গপ্পো' থেকে নেওয়া হয়েছে।

চিন্তাশীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'—দু - হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'— এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় নিমগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ।

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

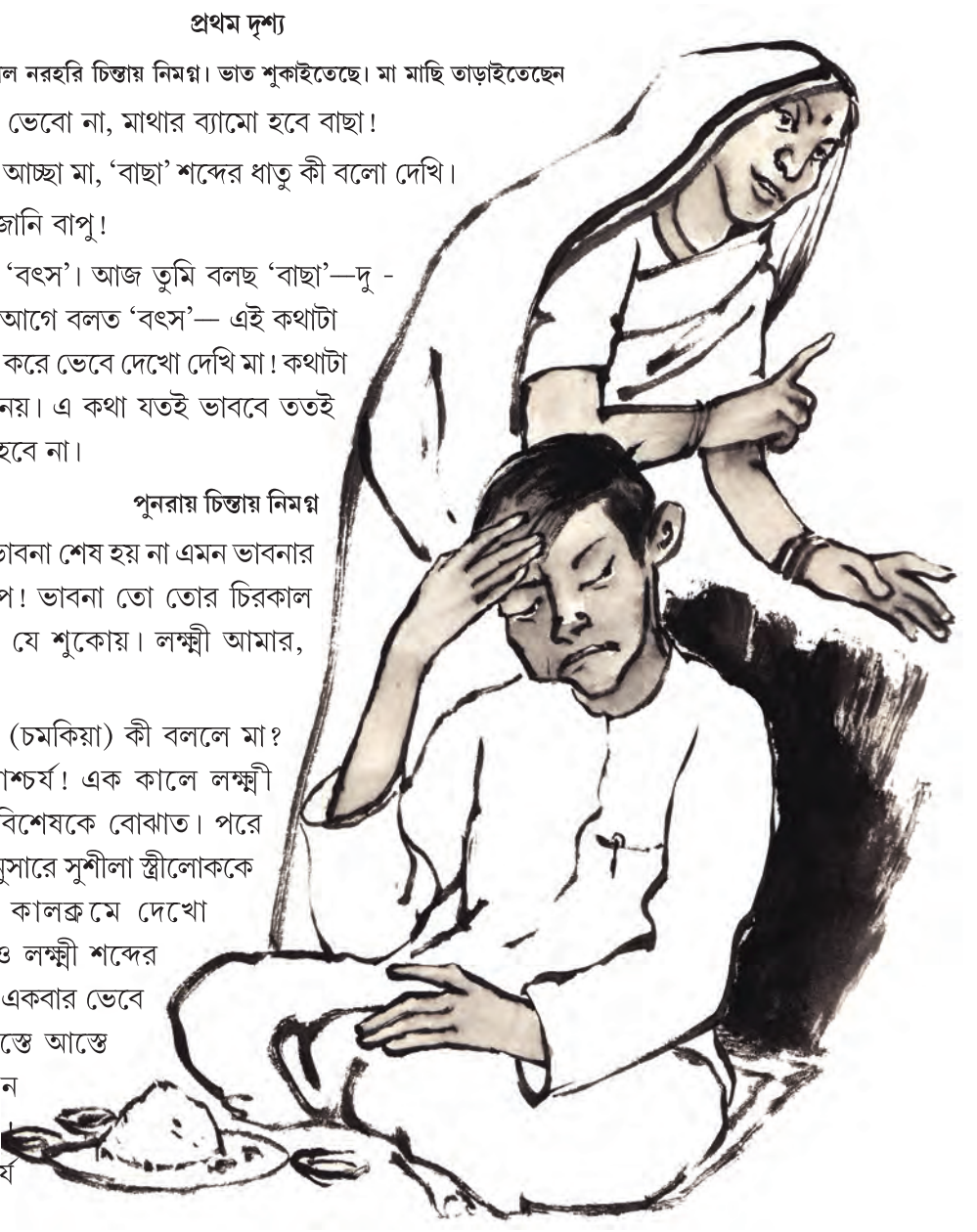

ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল দেখি উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে, ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান]

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি— সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয় না! অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না! আহা, কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বলো কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র!

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু !

[প্রস্থান]

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়!

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (চারি দিকে চাহিয়া) একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে— মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উলটো কথা বললে! মাছি তো ভন ভন করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশে

নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি-মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ-অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না—দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা, এসো আদর করি। (**শিশুকে কোলে লইয়া**) কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বল কী! ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জানো? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবন কালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায় — তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা!

মা। থাক বাবা, সে কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

(কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি। তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হলো না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছুদিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না— আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

১. **একই অর্থযুক্ত শব্দ নাটক থেকে খুঁজে বের করে লেখো :**

মক্ষিকা, হাজির, অস্থির, ব্যবস্থা, ঢাকা বা আবৃত।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ
আদর	———
———	ভেতো
শোক	———
———	প্রামাণ্য
নির্ভর	———
———	আমুদে

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ 'কথাটা বড়ো সামান্য নয়'— বক্তা কে? কার কোন কথাটা সামান্য নয়?

৩.২ 'এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো?'—কে কাকে এই কথা বলেছে? কোন ভাবনাকে বাজে বলা হয়েছে? তা কি সত্যিই 'বাজে ভাবনা' তোমার কি মনে হয়?

৩.৩ 'আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়।'— বক্তা কে? তার কোন কথায় নরহরি শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে?

৩.৪ 'রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি'— নরহরি কার কাছে কী প্রমাণ করে দিতে চেয়েছিল?

৩.৫ 'আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?'— এর প্রত্যুত্তরে নরু মাকে কী কী বলেছিল?

৩.৬ 'তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।'— কে কাকে বাধা দিতে চায়নি?

৩.৭ 'এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না'— কার স্বগতোক্তি? কাকে বেশি ভাবতে হলো না? কেন?

৪. 'চিন্তাশীল নরহরি সবার সব কথাতেই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে, অথচ মায়ের কাশীবাসী হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে শুনে তখনই সে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু তার মা যেই টাকার বন্দোবস্ত করতে বলেন, সে আবার ভাবতে বসে'— এ থেকে নরহরি চরিত্রটি সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা হলো?

৫. **ঠিক বানানটি বেছে নিয়ে লেখো :**

ব্যমো/ব্যামো	পরিবর্তণ/পরিবর্তন	ব্যাস্ত/ব্যস্ত
লক্ষ্মী/লক্ষী	প্রমান/প্রমাণ	মুখস্থ/মুখস্ত

৬. **নীচের বাক্যগুলিকে বদলে চলিত রীতিতে লেখো:**

৬.১ ভাত শুকাইতেছে, মা মাছি তাড়াইতেছেন।

৬.২ নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ।

৬.৩ নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন।

শব্দার্থ : ব্যামো — অসুখ। নিমগ্ন— ডুব দেওয়া বা নিমজ্জিত। ধাতু— ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি বা শব্দমূল (এখানে)। কুরুক্ষেত্র— কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। লোমাঞ্চিত— শিহরিত/ রোমাঞ্চিত। অন্তঃকরণ—হৃদয় বা মন। বদ্ধ— বাঁধা। দণ্ডবৎ— প্রণাম। আমোদ— আহ্লাদ/আনন্দ। নিতান্ত—খুব। বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা। রোসো— অপেক্ষা করো। চিন্তাশীল— ভাবুক।

৭. **অর্থ লেখো :**

বৎস, রোসো, দণ্ডবৎ, ভাগিনেয়, বন্দোবস্ত।

৮. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

পৃথিবী, সূর্য, স্ত্রীলোক, মা

৯. নাটক থেকে পাঁচটি নির্দেশক ও অনির্দেশক শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১০. ‘বাছা’ শব্দটি কোন ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ?

‘বাছা’ শব্দের দুটি প্রতিশব্দ লেখো।

১১. ‘দাড়ি’ শব্দের সাধু রূপটি লেখো।

১২. ‘হেসেই কুরুক্ষেত্র’— শব্দবন্ধের মূল ভাবটি কী?

১৩. ‘গুরু’ শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

১৪. ‘সূর্য তো অস্ত যায় না’ এখানে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস দেওয়া হয়েছে?

১৫. ‘মাথা’ শব্দটি কোন তৎসম শব্দ থেকে এসেছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ‘কথা ও কাহিনী’, ‘সহজপাঠ’, ‘রাজর্ষি’, ‘ছেলেবেলা’, ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ হাস্যকৌতুক’, ‘ডাকঘর’, ‘গল্পগুচ্ছ’- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে ‘Song Offerings’- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। ‘চিন্তাশীল’ নাটিকাটি তাঁর ‘হাস্যকৌতুক’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৬. 'ভাত জুড়িয়ে গেল'— এখানে কথাটির অর্থ ভাত ঠান্ডা হয়ে গেল/ শুকিয়ে গেল। 'জুড়িয়ে গেল' শব্দবন্ধকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করে একটি বাক্য লেখো।

১৭. 'মাছি ভন ভন করছে'— 'ভন ভন'—এর মতো আরো পাঁচটি ধ্বন্যাত্মক/অনুকার শব্দদ্বৈত তৈরি করো।

১৮. 'কাশী' কোন রাজ্যে অবস্থিত? 'কাশী'র প্রসিদ্ধির কারণ কী?

১৯. নাটকটিতে মোট কটি 'দৃশ্য' রয়েছে? কোন কোন দৃশ্যে কাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়?

২০. গুরুতর— এরকম শব্দের পরে 'তর' যোগ করে পাঁচটি নতুন শব্দ লেখো।

২১. সন্ধিবিচ্ছেদ করো— আশ্চর্য, উপস্থিত, পুনশ্চ।

২২. উচ্চারণে বিকৃত শব্দগুলির পাশাপাশি মূল শব্দগুলি লেখো :

জিজ্ঞেস, ব্যামো, কও, হপ্তা, দিকি, সম্মুখে।

২৩. নরহরি ভাগ্নের ডাকনামটি কী তা পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

২৪. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :**

বাঁচা	পুরুষ	সকল	পারা	ভাষা
বাছা	পরুষ	শকল	পাড়া	ভাসা

২৫. 'মাথা' শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

২৬. নাটকটির নামকরণ তোমার যথাযথ মনে হয়েছে কি-না তা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

২৭.

মূল শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত অর্থ
লক্ষ্মী		
অন্ন		
বৎস		

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভোরে এল আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল । কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলছে রেনক্ রোড তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দুর্যোগ বেশি, এবং দুঃসাধ্যও বটে। সুতরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসংকটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসংকট হলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক ক'মাইল আমার জানা নেই। এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙালি গিয়েছিলেন তিব্বতে।

তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বাংলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপুরের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়শো বছরের বেশি আগে ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানঋষি দীপঙ্কর তিব্বত গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নির্মল স্বরূপকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন এবং লাসার নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজা করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে , তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ড যখন তিব্বত জয় করতে যান, তখন শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন— এটি স্যার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপঙ্করের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালিও তিব্বতে গিয়ে আচার্য বোধিসত্ত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপুত্র শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপঙ্করের যে বিপুল কীর্তির কথা আমরা জানি, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মিরের পূর্ব প্রান্তে ভারত তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হলো গারটক, কিন্তু সে বহুদূর এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়ুনের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপু লেক গিরিসংকট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোট হলো তিব্বতিদের ঘাঁটি। নেপালেও আছে নামচেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা—সেই গতিতে গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চলে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতি আর মারোয়াড়ি তার আশেপাশে। এইটি হলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসা। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশ্য নির্দশন হলো বড়ো বড়ো অট্টালিকা,আর অগণ্য কুঠিবাড়ি।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। বড়ো গির্জাটা হলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে চড়াই-পথ এদিক ওদিক ঘুরে অনেক উঁচুতে গ্রেহামস হোমের দিকে। এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং সাহেব সুবার অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে মানুষ হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট কীর্তি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে আবার ফিরে এলুম ডা. দাশগুপ্তের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সংকীর্ণ গলির নীচে নেমে যে মন্দিরটির চত্বরে এসে দাঁড়ালুম, এটির কথা আজও ভুলিনি। দেখে নিলুম সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রিবাস করে গিয়েছিলুম আমি আর শশাঙ্ক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিলুম বটে, কিন্তু কালিম্পঙ চোখে পড়েনি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই ২৫ বৈশাখের অপরাহ্ণ। কবি রয়েছেন গৌরিপুর প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটর্নী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা । অমল হোমের কলম এবং রজনীগন্ধার গুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহাকবি জানতেন,আমি তখন 'যুগান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেখা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানা রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিগ্বলয় ছাড়িয়ে

কবির মাথা উঠেছে ধবলাধার গৌরীশৃঙ্গের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়ো,— পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড়ো এপিক পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাবুকে আনিয়েছি, ওঁর সাহায্য নেবো।—

তাঁকে যখন জানালুম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সুহাস কবির মুখখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাচ্ছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সুন্দর শ্বেতশ্মশ্রুময় মুখে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশয়ান। দু-চারটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছুটতে লাগলো। সেই বাণে আমিই বিদ্ধ হচ্ছি বারম্বার এবং হাসির রোল উঠছে এপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেইদিনকার সেই ২৫ বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে পাঠ করবেন, সেজন্য কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা— কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটনো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকেই। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। কয়েকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষে। তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত নৃপেন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্য পাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে সূক্ষ্ম যন্ত্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশঙ্কাটা ছিল রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মনে। সেজন্য উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে নৃপেনবাবু একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যন্ত্রে মুখ রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কেঁপে উঠলুম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হলো। নধর মখমল বসানো চেয়ারে বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো, ক্যালকাটা...হ্যালো...?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—'ও-কে'। (o.k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র— কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে— সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ করে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কণ্ঠের মূর্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়—

"আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হ'তে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো কিনা সেকথা তখন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরে। একটা মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম পরস্পরের অস্তিত্ব। (নির্বাচিত অংশ)

হাতেকলমে

শব্দার্থ : প্রাতরাশ—সকালের আহার, জলখাবার। দুর্যোগ—ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ভরা সময়। গিরিসংকট—পর্বতশ্রেণির মধ্যে সংকীর্ণ নিম্ন ভূমি, যা পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুলগুরু—বংশপরম্পরায় সকলেই যে গুরুর শিষ্য। আনুপূর্বিক— প্রথম থেকে শেষ, ক্রম অনুযায়ী। ভারতবরেণ্য—ভারতের বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ মানুষ। রাজপুত্র— রাজকুমার। রাজকীয়— রাজ-সম্বন্ধীয়, সরকারি। সম্বর্ধনা—সম্মান জানানোর অনুষ্ঠান। অগম্য— দুর্গম, সহজে যাওয়া যায় না যেখানে। কুঠিবাড়ি— রাজপুরুষ বা পদস্থ কর্মচারীর কার্যালয় ও বাসস্থান। অভিজাত—সমৃদ্ধ, কুলীন, শ্রেষ্ঠকুলজাত। সংকীর্ণ— অপ্রশস্ত, সরু। চত্বর—চাতাল। ঝুপসি— বায়ুপ্রবাহহীন আলোকশূন্য ঝোপঝাড়ের পরিবেশে অবস্থিত। ব্যক্তিত্ব— ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য/স্বাতন্ত্র্য। বৈদান্তিক— বেদান্তদর্শনে অভিজ্ঞ। রেখাচিত্র— কেবল রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। দিগ্বলয়— দিগন্তরেখা। দুরূহ— কঠিন, কষ্টসাধ্য। সৌম্য— প্রিয়দর্শন, প্রশান্ত। সুহাস— শোভন হাস্যযুক্ত। রক্তিমাভা— লাল আভা। শ্বেতশ্মশ্রুময়—সাদা দাড়ি ভরা। অর্ধশয়ান— আধশোওয়া। বাক্যবাণ— কথার আঘাত যা বিদ্ধ করে, নিষ্ঠুর কথা। নবরচিত— নতুন রচনা করা হয়েছে এমন। বেতারযোগে— রেডিয়োর মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষ— যাদের ওপর পরিচালনার ভার। বন্দোবস্ত— ব্যবস্থা। অর্থব্যয়—অনেক টাকা খরচ। বিশেষজ্ঞ— কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে যার। স্বনামখ্যাত— যে নিজের নামেই পরিচিত বা বিখ্যাত। বিদীর্ণ— ভগ্ন, খণ্ডিত। ফরমাশ— আদেশ, নির্দেশ। নধর— সরস কোমল লাবণ্যময়। তৎক্ষণাৎ— তখনই। রোমাঞ্চ— পুলক, হর্ষ। পুলক— হর্ষ, আনন্দ। মূর্ছনা—সুরের আরোহণ ও অবরোহণ। উচ্ছ্বসিত— স্ফুরিত, স্পন্দিত, উৎফুল্ল। বিলুপ্ত—সম্পূর্ণ লোপ। ছাড়পত্র— রসিদ, দাবি-ত্যাগের প্রমাণপত্র। মায়াচ্ছন্ন— মায়ায় ঢাকা। স্বপ্নলোক— স্বপ্নের রাজ্য। অস্তিত্ব— সত্তা, বিদ্যমানতা।

১. বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো :

১.১ লামারা রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন রাজপুত্র (তিষ্য রক্ষিত/শান্ত রক্ষিত/ কুমার রক্ষিত)-কে।

১.২ তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসা (পশম/ রেশম/ তাঁতবস্ত্র)-এর।

১.৩ কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক (বড়ো মন্দির/ বড়ো মসজিদ/বড়ো গির্জা)।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখক তুলে দিয়েছিলেন (অমৃতবাজার পত্রিকা/ যুগান্তর/ আনন্দবাজার পত্রিকা)-র 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'।

১.৫ নবরচিত একটি কবিতা রেডিওতে আবৃত্তি করতে রবীন্দ্রনাথের সময় লেগেছিল (আধ ঘণ্টা/ পঁয়তাল্লিশ মিনিট/ পনেরো মিনিট)।

২. ঘটে-যাওয়া ঘটনার ক্রম অনুযায়ী নীচের এলোমেলো ঘটনাগুলি সাজিয়ে লেখো :

২.১ কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এল- 'ও.কে।'

২.২ কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন।

২.৩ ২৫ বৈশাখের সন্ধ্যায় জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করবেন।

২.৪ প্রস্তুতির সময়ে নরম মখমল বসানো চেয়ারে বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো ক্যালকাটা...হ্যালো.... ?

২.৫ সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটানো হলো কদিন ধরে।

২.৬ বেতার কর্তৃপক্ষ কবির কণ্ঠস্বরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করবেন, তাই এই ব্যবস্থা।

২.৭ কবির জন্মদিনের কবিতাপাঠের জন্য কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত হলো।

৩. **নীচের বাক্যগুলিতে দাগ-দেওয়া শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দ পাঠ্য অংশটিতে পাবে। উপযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো :**

৩.১ শরৎচন্দ্র দাসের ভ্রমণের বিবরণ থেকেই প্রথম তিব্বতের কথা জানা যায়।
৩.২ এই পথে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি তিব্বতে গিয়েছিলেন।
৩.৩ সবার অগোচরে আত্মগোপনের জন্য অন্যরকম পোশাক পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র একদিন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলেন।
৩.৪ ভুল মানুষমাত্রেরই হতে পারে, তবে নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ার সাহসও থাকা উচিত।
৩.৫ যাদের ওপর পরিচালনার ভার, এ-কাজের জন্য আগে তাদের দাবি-ত্যাগের প্রমাণপত্র প্রয়োজন।
৩.৬ যাঁরা নিজের নামেই বিখ্যাত, ভারতের সেই বরণীয় মানুষদেরই সম্মাননার আয়োজন হয়েছে এই সভায়।

৪. **নীচের বাক্যগুলিতে যে ইংরেজি শব্দগুলি আছে, তার বদলে বাংলা শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো :** (বাংলা শব্দের জন্য পাশের শব্দঝুড়ির সাহায্য নিতে পারো)

৪.১ ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সারা হলো।
৪.২ অত বড়ো এপিক পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যে নেই।
৪.৩ কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না।
৪.৪ বেতার-কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন।
৪.৫ ভোরে আমার ড্রাইভার এল গাড়ি নিয়ে।
৪.৬ একটা বুঝি বেল বাজল।
৪.৭ গির্জাটা হলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক।

পথনির্দেশক চিহ্ন, সম্প্রচার, ঘণ্টা, মহাকাব্য, দূরভাষ, খাবারঘর, গাড়িচালক।

৫. **নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**
মেঘময়, ভীষণ, মায়াচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম, দীপ্ত, অগম্য, বিপুল, ঝুপসি

৬. **নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**
কণ্ঠস্বর, স্বপ্নলোক, ব্যক্তিত্ব, আশঙ্কা, ইতিবৃত্ত, কীর্তি, রেখাচিত্র, দিগ্বলয়

৭. **নীচের দাগ-দেওয়া শব্দগুলি কী জাতীয়? শব্দগুলির বিশিষ্টতা উল্লেখ করে শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :**

৭.১ শীতের হাওয়া ছিল কনকনে।
৭.২ ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।
৭.৩ পায়ের নীচে কালিম্পঙ থরথর করতে লাগল কিনা আর মনে রইল না।

৮. **নীচের বাক্যগুলি থেকে তারতম্যসূচক শব্দগুলি খুঁজে বার করো। কোনটি দুয়ের মধ্যে তুলনা, আর কোনটি বহুর মধ্যে তুলনা, তা নির্দেশ করে শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :**

৮.১ পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি।
৮.২ এর চেয়ে মহত্তর উদ্যোগ আর দেখিনি।
৮.৩ বাংলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ।
৮.৪ পাশের গলিটি সংকীর্ণতর হয়ে এসেছে।
৮.৫ অল্প আয়োজনে শুরু হলো দীর্ঘতম যাত্রা।

৯. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ, অনির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ আর পূরণবাচক শব্দগুলি খুঁজে বার করে লেখো:

৯.১ গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসংকট হলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল।
৯.২ তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন।
৯.৩ দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়।
৯.৪ শরৎচন্দ্র দাস গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ ভাগে।
৯.৫ অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুত্র তিব্বতে যান।
৯.৬ বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘন্টা, সেই গতিতে গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?
৯.৭ একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগল।
৯.৮ মনে পড়ে সেই ২৫ বৈশাখের অপরাহ্ণ।
৯.৯ যেখানে বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রি বাস করে গিয়েছিলাম।
৯.১০ কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন।

১০. নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে বদলে লেখো :
প্রণাম, অনুরোধ, পৃথিবী, উদ্বোধন, পূজা, উদ্বেগ, পুলক, আশঙ্কা

১১. নীচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :
বৈদান্তিক, নবরচিত, অভিজাত, উচ্ছ্বসিত, প্রসিদ্ধ, প্রচলিত, প্রচুর, প্রধান

১২. নীচের শব্দগুলির সন্ধি ভেঙে লেখো :
শশাঙ্ক, হিমালয়, সর্বাপেক্ষা, অন্যান্য, রক্তিমাভা, যুগান্তর, মায়াচ্ছন্ন, অপরাহ্ণ, সর্বাধিক, রথীন্দ্র, নৃপেন্দ্র, স্বীকারোক্তি, শয়ান, সম্বর্ধনা, উন্নতি, অপরিচ্ছন্ন, দিগ্বলয়, বারম্বার, উদ্বোধন, উচ্ছ্বসিত

১৩. নীচের প্রতিটি শব্দের মধ্যেই দুটি করে শব্দ আছে, বুঝে নিয়ে ভেঙে লেখো :
জগৎপ্রসিদ্ধ, গিরিসংকট, কুলগুরু, ঠাকুরবাড়ি, ভ্রমণবৃত্তান্ত, রাজপুত্র, ছদ্মবেশ, কুঠিবাড়ি, অর্থব্যয়, নবরচিত, মহাকবি, ভারতবরেণ্য, স্বনামখ্যাত, স্বপ্নলোক, জন্মদিন

১৪. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

১৪.১ তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজা করে।
১৪.২ তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে।
১৪.৩ কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন ।
১৪.৪ কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।
১৪.৫ শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন।

১৫. একটি বাক্যে উত্তর দাও:

১৫.১ প্রাচীন পথ ধরে কোন তিনজন প্রসিদ্ধ বাঙালি অতীতে তিব্বতে গিয়েছিলেন?
১৫.২ কোন প্রাচীন পথের রেখা ধরে তাঁরা গিয়েছিলেন?
১৫.৩ এখনকার পর্যটকরা এই প্রাচীন পথটি পরিহার করেন কেন?
১৫.৪ কোন দুই বিখ্যাত বাঙালি তিব্বতে গিয়ে বোধিসত্ত্ব উপাধি লাভ করেছিলেন?
১৫.৫ ছদ্মবেশে কে গিয়েছিলেন তিব্বতে?
১৫.৬ স্যার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল তিব্বত-বিষয়ক কোন বইটি?
১৫.৭ কালিম্পঙের কোথায় পড়াশুনো করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইংরেজ অনাথ ছেলেমেয়েরা ?
১৫.৮ গৌরীপুর প্রাসাদে কারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী?
১৫.৯ লেখকের অনুরোধে কোন পত্রিকার জন্য অনেকবার লেখা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ?
১৫.১০ ২৫ বৈশাখের সেই বিশেষ দিনটি যে ছিল শুক্লপক্ষ, লেখা থেকে সেকথা জানতে পারো কেমন করে?

১৬. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও:

১৬.১ কীভাবে গেলে পৌঁছনো যায় কালিম্পঙের গ্রেহামস হোম-এ? এই হোমটির বিশিষ্টতা কী?

১৬.২ ২৫ বৈশাখের 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম পাতায় শিল্পীর আঁকা যে বিশেষ রেখাচিত্রটি প্রকাশ পেয়েছিল, তার বিষয় কী ছিল? রবীন্দ্র-জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে ছবির এই বিষয়টি তোমার যথার্থ মনে হয় কিনা, লেখো।

১৬.৩ 'কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে'— কোন কাজটি সম্পন্ন করবার ইচ্ছে লেখককে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? কেন সে-কাজ করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর? কার সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন ওই কাজে?

১৬.৪ 'এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?'— কোন প্রসঙ্গে এই পরিহাস রবীন্দ্রনাথের?

১৬.৫ 'কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।' 'বাগে পেয়েছিলেন'— এই বিশিষ্ট ক্রিয়াপদটির অর্থ কী? তাঁকে কবির 'বাগে পাওয়া'র কী পরিচয় রয়েছে লেখকের সেদিনের বিবরণে?

১৬.৬ 'কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উদ্বোধন'— কোন বিশেষ উপলক্ষে, কীভাবে এই উদ্বোধন সম্পন্ন হলো?

১৬.৭ 'কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হলো'— নৃপেন্দ্রবাবু কে? কী ছিল তাঁর ফরমাশ? কীভাবে তা শুনেছিলেন লেখক?

১৬.৮ জন্মদিনে কবির স্বকণ্ঠে বেতার-সম্প্রচারিত কবিতা শোনাবার মুহূর্তটি কীভাবে ধরা দিয়েছিল তাঁর শ্রোতাদের চেতনায়?

১৭. দশটি বাক্যের মধ্যে উত্তর দাও :

১৭.১ এ-লেখায় একটা হারিয়ে-যাওয়া সময়ের ছবি আছে, ভারতবর্ষ তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন সন্তানের কথা আছে,যাঁদের সঙ্গে একসময় তিব্বতের নিবিড় যোগ রচিত হয়েছিল। লেখাটি অনুসরণ করে বাংলার ওই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয়েছে, নিজের ভাষায় লেখো।

১৭.২ এই লেখার একটি প্রধান চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি। কালিম্পঙ শহরে অতিবাহিত তাঁর একটি বিশেষ জন্মদিন উদ্‌যাপনের সম্পূর্ণ ছবিটি যেভাবে এখানে ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দাও।

১৭.৩ ইতিহাস-ভূগোলের ইতিবৃত্তে জড়ানো কালিম্পঙ নামে একটা শহরকে নতুন করে চিনতে তোমার কেমন লাগল, একটা অনুচ্ছেদে তা লেখো।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫—১৯৮৩) : বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ভ্রমণকাহিনি রচয়িতা। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখকদের অন্যতম। প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর'। 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামে বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি লিখে প্রবোধকুমার বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন; এই গ্রন্থেই ভ্রমণ এবং উপন্যাসের একটি মিশ্র রূপ সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'চেনা ও জানা', 'নিশিপদ্ম', 'তুচ্ছ' প্রভৃতি ছোটোগল্প সংকলন, এবং 'প্রিয়বান্ধবী', 'নদ ও নদী', 'বনহংসী' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'বনস্পতির বৈঠক'।

'দেবতাত্মা হিমালয়' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) তাঁর ভ্রামণিক সত্তার একটি উজ্জ্বল পরিচয়। পাঠ্য অংশটি 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর প্রথম খণ্ডের 'কালিম্পঙ' অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

বই-টই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাই তো কাটি ছড়া,
বই পড়া সব মিছে-ই যদি
না হল টই পড়া।

টই পড়া যায় পড়তে কোথায়?
বলছি তবে শোনো,
বই-এর মাঝে লুকিয়ে থাকে
টই সে কোনো কোনো।

আর পাবে টই সকালবেলা
বই থেকে মুখ তুলে,
হঠাৎ যদি বাইরে চেয়ে
মনটা ওঠে দুলে।

টই থাকে সব রোদ-মাখানো
গাছের ডালে পাতায়,
টই থাকে সেই আকাশ-ছোঁয়া
খোলা মাঠের খাতায়।

টই চমকায় বিজলি হয়ে
আঁধার-করা মেঘে,
খই হয়ে টই ফোটে দিঘির
জলে বৃষ্টি লেগে।

টই কাঁপে সব ছোট্ট পাখির
রং-বেরঙের পাখায়,
খোকা-খুকুর মুখে আবার
মিষ্টি হাসি মাখায়।

বই পড়ো খুব যত পারো
সঙ্গে পড়ো টই,
টই নইলে থাকত কোথায়
এত রকম বই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি-লেখক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'। অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'সাগর থেকে ফেরা'। উপন্যাস—'পাঁক', 'প্রতিশোধ', 'আগামীকাল' ইত্যাদি। 'ঘনাদা' চরিত্রের স্রষ্টা। বহু ছোটোগল্প লিখেছেন।

বই পড়ার কায়দা কানুন

তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে যেতে পাপাই এসেছিল লাইব্রেরিতে আগের দিনের আদ্ধেক পড়া বইটা পড়বে বলে। রোজই লাইব্রেরিতে এসে নানারকম বই পড়তে তার খুব ভালো লাগে। কিন্তু পাপাই আজ খুব মুস্কিলে পড়েছে। কেননা আগের দিনের আদ্ধেক পড়া বইটা কিছুতেই সে খুঁজে পাচ্ছেনা।

লাইব্রেরিয়ান কাকু পাপাইকে বইটার নাম, বইটা কার লেখা অর্থাৎ বইটার লেখক কে জানতে চাইলে পাপাই তা বলতে পারেনি। কিন্তু বইটাতে যে চাকা, আগুন ইত্যাদি আবিষ্কারের গল্প ছিল অর্থাৎ বইটা কী নিয়ে লেখা তা মোটামুটি বলতে পেরেছিল। এইটুকু জেনেই লাইব্রেরিয়ান কাকু পাপাইকে বইটা খুঁজে দিলেন। লাইব্রেরিতে এত বইএর মাঝেও ঠিক বইটা খুঁজে পাওয়ার রহস্যটা যে বইটার নাম, লেখকের নাম অথবা বিষয়টা জানা আর কার পরে কোন বিষয় রাখা হয় আর কেনই বা রাখা হয় তার গল্পটা পাপাইকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে পাপাই আর লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুঁজে পেতে কখনো মুশকিলে পড়েনি। তোমারও শুনে নাও গল্পটা, তাহলে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পেতে অসুবিধা হবে না।

অনেকদিন আগে যখন মানুষ একা একাই গুহায় বাস করত, বনে বনে ফলমূল খেয়ে থাকতো তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসতো। যেমন ধরো রোজ সকালে আকাশে সূর্যকে দেখে সে ভাবতো এটা কী, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় যে বিষয় তৈরি হলো তার নাম **দর্শন**, বিদ্যুৎ চমকানো, বাজ পড়া, প্রবল বৃষ্টি, প্রকৃতির এইসব ঘটনায় মানুষের মনে ভয় থেকে জন্ম নিল অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা। এই ধারণা থেকে যে বোধ সৃষ্টি হলো তা মানুষকে সুন্দর জীবন আচরণ করতেও শেখাল, আমাদের ধারণ করল। তাই এই নিয়ে গড়ে ওঠা বিষয়ের নাম **ধর্ম**।

অনেক পরে একলা মানুষ গুহা ছেড়ে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে সহযোগিতা করে বাঁচার জন্য সমাজ তৈরি করল। সমাজের নানা দিক নিয়ে যে জ্ঞান তার নাম হলো **সমাজবিদ্যা**। সমাজ পরিচালনার নীতি নিয়ম, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-কানুন এই সবের চর্চা থেকে এল রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন ইত্যাদি বিষয়। সমাজ তৈরির পর সমাজে থাকতে গেলে প্রথমেই দরকার হলো আমার মনের ভাব অন্যকে বোঝানো এবং অন্যেরা কী বলতে চায় তা বোঝা অর্থাৎ ভাষার। তাই পরের বিষয় **ভাষা**।

প্রতিদিনের জীবনে তখন মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হতো। মানুষ তাঁর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটু একটু করে জেনে ফেলল তার চারপাশের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার পেছনে আসল কারণগুলো কী কী, অর্থাৎ শিখল **বিজ্ঞান** নামের বিষয়টি। বিজ্ঞানের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন অঙ্ক বা গণিত, মহাকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ শিখে ফেলল চাষবাস, আবিষ্কার করল নানারকম যন্ত্রপাতি। জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠল। জ্ঞানের এই দিকের নাম দেওয়া হলো **প্রযুক্তি**।

মানুষের মাথার মধ্যে তিনটে ঘর আছে। একটা ঘরে বাস করে যুক্তি আর বুদ্ধি, দ্বিতীয় ঘরে বাস করে কল্পনা আর তৃতীয় ঘরে বাস করে স্মৃতি। মানুষের যাবতীয় কাজ পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করে এই যুক্তি, কল্পনা আর স্মৃতি। দর্শন থেকে প্রযুক্তি পর্যন্ত যে যে বিষয়গুলো আমরা পেলাম তার পেছনে আছে যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ। এই বিষয়গুলো জানার ফলে মানুষ বাঁচার জন্য যা লাগে যেমন খাদ্য, পোশাক আর বাড়িঘরের ব্যবস্থা করতে পারল।

এর পরেও তারা থেমে থাকল না। কল্পনাশক্তি দিয়ে ছবি আঁকল, মূর্তি তৈরি করল, গান গাইল, নাটক করল, খেলাধূলা নিয়ে মেতে উঠল। সৃষ্টি হল বিষয় **শিল্প**। আর যখন সে লিখতে শিখল, সৃষ্টি হলো কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধের। সব মিলিয়ে বলা হলো **সাহিত্য**।

এই সব সৃষ্টিকে ধরে রাখল স্মৃতি। স্মৃতিঘরের নিয়ন্ত্রণে তিনটি বিষয় পাওয়া গেল — **ইতিহাস, ভূগোল আর জীবনী।**

১৮৭৬ সালে মেলভিল ডিউই নামের আমেরিকার একজন গণিতজ্ঞ ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী ০ থেকে ৯ দশমিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে একএকটা বিষয় চিহ্নিত করে সব বিষয়ের বইকে লাইব্রেরিতে সাজানোর জন্য একটা উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তৈরি তালিকাটি একবার মনে রেখে গল্পের সঙ্গে আর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

১০০ - দর্শন
২০০ - ধর্ম
৩০০ - সমাজ
৪০০ - ভাষা
৫০০ - বিজ্ঞান
৬০০ - প্রযুক্তি
৭০০ - শিল্প
৮০০ - সাহিত্য
৯০০ - ইতিহাস, ভূগোল আর জীবনী
০০০ - সাধারণ বিষয় যেমন অভিধান বিশ্বকোষ, খবরের কাগজ ইত্যাদি।

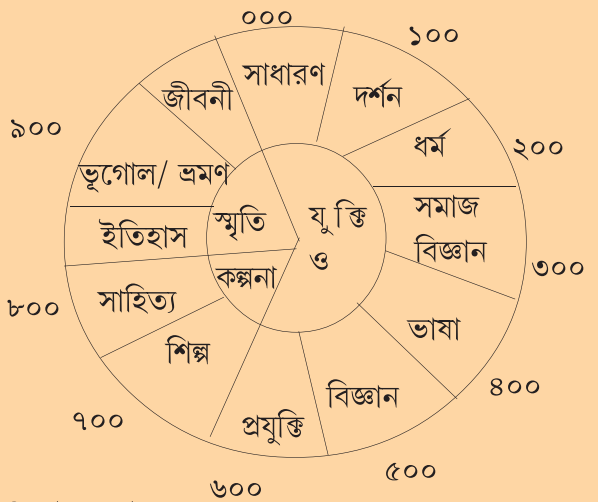

তবে সব লাইব্রেরিতেই যে বই এভাবে রাখা হয় তা নয়। কোথাও কোথাও লেখকের নাম ধরে বা অন্যভাবেও বই সাজানো থাকে। তাই লেখকের নাম বা বইটার নাম বা আখ্যা জেনে রাখা ভালো। নিজের স্কুলের বা পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে নাও কেমন করে সাজানো থাকে বইগুলো। আর ভালো করে দেখো বইয়ের নানা অংশ, যেমন আখ্যাপত্র, সূচিপত্র ইত্যাদি। তা হলে বই পড়া আর লাইব্রেরির ব্যবহার করা অনেক সহজ হবে।

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত

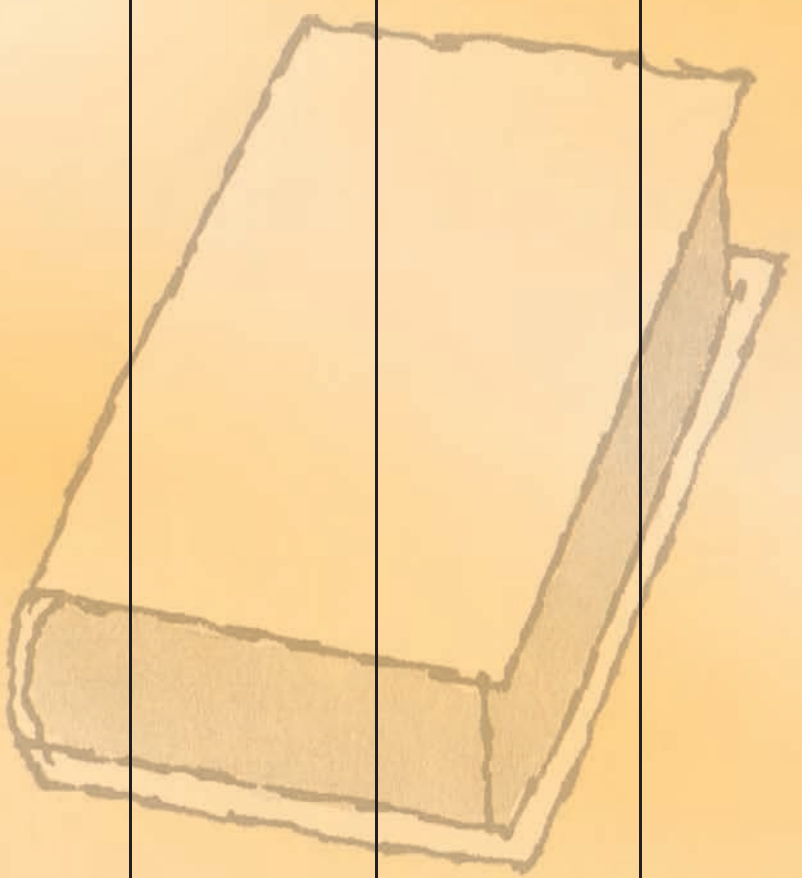

শিখন পরামর্শ

- বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তক সপ্তম শ্রেণি-বাংলা (সাহিত্য মেলা) রূপায়িত হলো। পড়ানোর আগে পুরো বইটি যত্ন নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান'। নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে তুলে ধরা হয়েছে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, আর তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানবমনের বহুমাত্রিক কল্পনা। শিক্ষার্থীরা এই বইয়ে পড়বে কল্পবিজ্ঞানের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গদ্য ও কবিতা, শিল্পী ও চিত্রকরের আত্মকথা, ছবি আঁকার গল্প, গানের গল্প, জাদু কাহিনি, খেলার গল্প, প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে অনূদিত কবিতা ও গল্প, চিঠি, মজার নাটক, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবী চরিতকথা। এছাড়াও বিভিন্ন লেখার সঙ্গে 'মিলিয়ে পড়ো' অংশ তো রইলই। মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, তা একটি বিশেষ অভিমুখে গতিময় ঝোঁক। কিশোর মনের স্বাধীনতাকে সেই প্রকল্প ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত করে নতুন কল্পনা আর শিখনের জগৎ। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোলায়, ভাবায়, আলোড়িত করে। এভাবেই কিশোর মন বইয়ের মধ্যে খুঁজে পায় নিজের ভাবনা ও কল্পনার খোরাক। তাই বইটিকে কাজে লাগিয়ে বদলাতে হবে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের বহু ধরনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে সে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিশেষভাবে দেখতে হবে,সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় নির্ভুলভাবে কোনো বিষয়ে তার বক্তব্য লিখতে পারছে কিনা। সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। যেকোনো পাঠের ক্ষেত্রেই, সে গদ্যই হোক বা কবিতা, শিক্ষার্থী যেন সেই পাঠকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো মৌলিক ভাবনা বলতে এবং যুক্তি দিয়ে লিখতে শেখে। ধাপে ধাপে তাকে পাঠ্যবস্তুটি সম্পর্কে যেমন বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করতে হবে, পাশাপাশি সেই পাঠ্য প্রসঙ্গের অনুষঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে যেন সে চিন্তা করতে শেখে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। নীচের রেখাচিত্রটি সেকথা মনেরেখেই তৈরি করা হয়েছে।

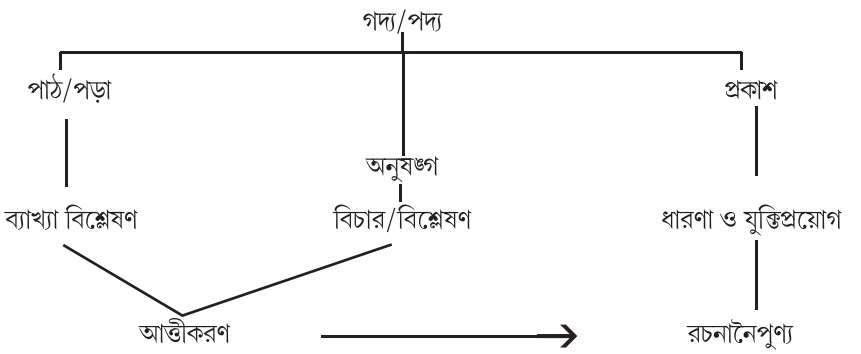

- দলগত এবং একক পাঠ উভয় বিষয় উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। নানা পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। 'হাতে-কলমে' অংশটিকে রূপরেখা হিসেবে ধরে এগোতে হবে।
- 'হাতে-কলমে' বিভাগের 'মিলিয়ে পড়ো' অংশে কিছু আছে কিনা দেখে নিন। কেননা ওখানে দেওয়া আর একটি ছড়া বা কবিতা বা গল্প তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেওয়া নয়, বরং তা লেখকের বিষয়গত দৃষ্টিকোণটিকে আর একটু প্রসারিত করে, বা নতুন কোনো মজার ভাবনা মেলে ধরে, যা হয়তো শিক্ষার্থীর মনের একটু কাছাকছি। এই অংশটিকে আপনি মূল পাঠ্যের মাঝে বা শেষে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন।

- এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে আপনি কবিতা কিংবা গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়গ্রাহী করার জন্য ব্যাখ্যায় উৎসাহিত করুন। এক্ষেত্রে দলগত ব্যখ্যা থেকে আমরা ব্যক্তিগত মতামতের দিকে যাবো। শিক্ষার্থীরা এই আলোচনায় আনন্দ পাবে, আপনিও এই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে তার একঘেয়েমি কেটে যাবে, নতুন করে পাঠে তার মনোযোগ ফিরে আসবে। তখন আবার পাঠ্যের পরবর্তী অংশে ফিরে আসুন এবং অগ্রসর হন।
- 'মিলিয়ে পড়ো' অংশ যদি না থাকে, সবক্ষেত্রে নেইও, সেক্ষেত্রে 'হাতে-কলমে' বিভাগটি দেখবেন সেখানে চিঠি লেখা,গল্প সম্পূর্ণ করা, কিংবা ছোটো অনুচ্ছেদ লেখা ইত্যাদি কাজগুলি ব্যবহার করুন এবং আগের শ্রেণিতে শিখে আসা দিনলিপি লেখা, সংলাপ, ছবি দেখে লেখা, মানস মানচিত্র তৈরি করা প্রভৃতি কাজগুলিকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনুন। এক্ষেত্রে আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে নানারকম Open ended task -এ জড়িয়ে নিয়ে তাকে মুক্ত চিন্তার সুযোগ দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্যকারীর ভূমিকায় থেকে মনে মনে ভেবে লিখতে উৎসাহ দেবেন।
- এই শ্রেণি থেকেই সুযোগ থাকলে কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো দলকে প্রজেক্ট তৈরি করতে উৎসাহ দিন। যেমন ভাস্কর্য থেকে মাটির কাজ বা কোনো একটি সাংস্কৃতিক দিককে নিয়ে স্থানীয় সাংস্কৃতিক বিশেষত্বগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রজেক্ট করা যেতে পারে।
- আশা করি আমরা কীভাবে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছি তা স্পষ্ট করা গেছে। পাঠের সঙ্গে শিশুর নিরবচ্ছিন্ন যোগ তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই পাঠ চলাকালীন যেকোনো সময় 'হাতে-কলমে'র যে কোনো অংশ আমরা কাজে লাগাবো বিশ্লেষণে, নির্মাণে পুরোটাই শিশুকে সক্রিয়তায় জড়িয়ে রেখে। এই ভাবে 'পাঠ' আর 'হাতে-কলমে' অংশ একসঙ্গে শেষ করা যাবে।
- এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক ভাবে বজায় রাখলে শিশুর মনে সাহিত্যের রসাস্বাদন করার ক্ষমতা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি তাকে বুঝে প্রকাশ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠবে। শিশুরা তাদের আঁকা ছবি ও খাতায় লেখা দিনলিপি ও চিঠি সাজিয়ে নিজেরাই তৈরি করতে পারবে নিজেদের দেওয়াল পত্রিকা। আপনি শুধু ওদের সঙ্গে থাকুন।
- এছাড়া আপনি 'হাতে-কলমে'র লেখক-পরিচিতি অংশ নিয়ে কাজ করার সময় সেই লেখকের অন্য কোনো লেখা তাদের পড়ে শোনাতে, গ্রন্থাগারে যেতে ও আরও পড়তে তাদের উৎসাহিত করবেন। গ্রন্থাগার না থাকলে নিজেই বই এনে তাদের পড়ে শোনান। পাঠ্য বইয়ের 'বই-পড়ো' রচনাটির সঙ্গে প্রদত্ত তালিকাটি অবশ্যই পূরণ করতে বলুন।
- এবার আসি ব্যাকরণের কথায়। নতুন পাঠক্রমে ব্যাকরণের বিষয়টি তার সুস্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে আরম্ভ হচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ... এই ভাবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার যাত্রা। এই বছর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন বই চালু হলেও চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে তা হচ্ছে না। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্কে গ্রথিত এই বিন্যাসে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির অংশটিকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে পঞ্চম বা সপ্তম শ্রেণির সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ব্যাকরণ রাখা যেতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। তাই সপ্তম শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যাকরণের পুরোনো পাঠ্যসূচি অনুসৃত হবে।
- তবে উপরের এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নতুন বইয়ের 'হাতে-কলমে' অংশে ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চায় নতুন ও পুরোনোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান বইটিতে ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে রয়েছে বানান-বিধি সম্পর্কে পরিচিতি, এছাড়াও বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া, বচন, সন্ধি, কারক ও অকারক, প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ, নির্দেশক ও অনির্দেশক শব্দ, সমার্থক ও প্রায় সমার্থক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি, বিপরীতার্থক শব্দ, ক্রিয়ার কাল নির্ণয়, বাক্যের সাধারণ গঠন, উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারক, শব্দ ভাণ্ডার, প্রচলিত শব্দের আদি ও পরিবর্তিত অর্থ প্রভৃতি জরুরি প্রসঙ্গগুলি এসেছে। এছাড়া জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের সম্ভার সমগ্র বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সবসময় পাঠ্যকেন্দ্রিক প্রশ্ন থেকে ধীরে ধীরে পাঠ্যবই অতিক্রমকারী মৌলিক ধারণা প্রকাশের সুযোগ আছে এমন Learning task -এর দিকে এগিয়ে চলুন।
- পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থবিদ্যা চর্চা কোনোক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়। পাঠ্য পুস্তক পরিকল্পনায় এবং তার অনুশীলনীতে সেই প্রথাবদ্ধ ধরনকে বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।
- হাতে-কলমে অংশটিকে বিশেষ গুরুত্ব এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষার্থী একতরফা শুনে যাওয়ার পরিবর্তে সক্রিয়তার মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শেখে।
- শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রতিটি পাঠ্যাংশ পড়ানোর ক্ষেত্রে বা হাতেকলমে চর্চার প্রসঙ্গে যে কোনো ধরনের উজ্জীবনী তথা উদ্ভাবনী অংশ সংযোজন করতে পারেন।
- পাঠ্যসূচিতে থাকা গানগুলি শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেয়ে শোনাবেন, এছাড়া কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যও নিতে

পারেন। শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। এই গানগুলি বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়, সেখানে ব্যবহার করবেন। গানকে গান হিসেবেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রাখবেন। কবিতা হিসেবে নয়। পারলে এইধরনের আরও গান শোনান ও শেখান।

- বইটি পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের প্রধান নজর থাকবে শিক্ষার্থীর শিখনস্তরের দিকে। প্রয়োজনে তিনি পূর্বপাঠের পুনরালোচনা বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ পাঠ-পরিকল্পনার কথাও ভাবতে পারেন।
- সমগ্র পুস্তকটিই পাঠ্য। অংশবিশেষ পাঠ্য নয়। পাঠদানের ধারাবাহিক গতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু তা কখনোই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর কথা ভুলে গিয়ে নয়।
- শিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

* 'মাকু' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। মোট এগারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি পিরিয়ড নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিমাসে একটি করে অধ্যায় শেষ করবেন। শেষ দুটি অধ্যায় (দশম ও একাদশ) একত্রে পড়ানো সম্ভব। এইভাবে মোট দশটি মাসে পাঠ্যটিকে ভাগ করে নিয়ে পড়াতে পারেন। বইটির পরিশিষ্ট 'হাতে-কলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকলো। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন-নতুন প্রশ্ন ও অন্যান্য কৃত্যালি উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম পাঠ এবং বই পড়ার কায়দা কানুন*	ছন্দ ও সুর সম্পর্কে ধারণা লাভ ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা।
ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয় পাঠ	মাতৃভাষা ও স্বদেশ চেতনা।
মার্চ	তৃতীয় পাঠ	ছবি, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ। এই বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দান।
এপ্রিল	চতুর্থ পাঠ	বিজ্ঞানমনস্কতা ও মনুষ্যত্ব।
মে	পঞ্চম পাঠ	বাংলা গানের কারিগর বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের গানের নেপথ্যের গল্প জানা গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দান। বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা অন্যান্য গীতিকারদের জন্মদিন পালন।
জুন জুলাই	ষষ্ঠও সপ্তম পাঠ	বর্ষার গানের চর্চা। রজনীকান্তের গান সম্পর্কে ধারণা।
আগস্ট সেপ্টেম্বর	অষ্টম ও নবম পাঠ	দেশের কথা ও দেশাত্মবোধক গানের চর্চা। খেলা ও খেলার সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা। লোকসংগীত সম্পর্কে ধারণা।
অক্টোবর নভেম্বর	দশম পাঠ একাদশ পাঠ	নাটকটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ে উৎসাহ দিন।

* দুমাস অন্তর বইপড়া নিয়ে কথা বলুন। প্রত্যেকের 'বইপড়ার ডায়েরি' অংশটি দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।